ওঁ

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

"অভিক্ষা"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ঃ—

—"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"—

স্বামী স্বরূপানন্দ
পরমহংস

মূল্য এক টাকা মাত্র।

ওঁ

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

পুপুন্‌কী অযাচক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-প্রণীত

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ,
ফাল্গুন, ১৩৪১

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার, জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দুঃখে চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে লভিবে ভারত লুপ্তমান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ, শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।
(স্বরূপানন্দ)

পুপুন্‌কী-অযাচক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম।

মূল্য এক টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রকাশক ঃ—

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন,

৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ তে পুস্তক প্রেরণ অসুবিধাজনক)

স্বামীজীর আশ্রমের পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিনিধি

ব্রহ্মচারী শ্রীহরি

স্বরূপানন্দ কুটীর, পোঃ—ফেনী, নোয়াখালী।

অপরাপর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মহেশ লাইব্রেরী,

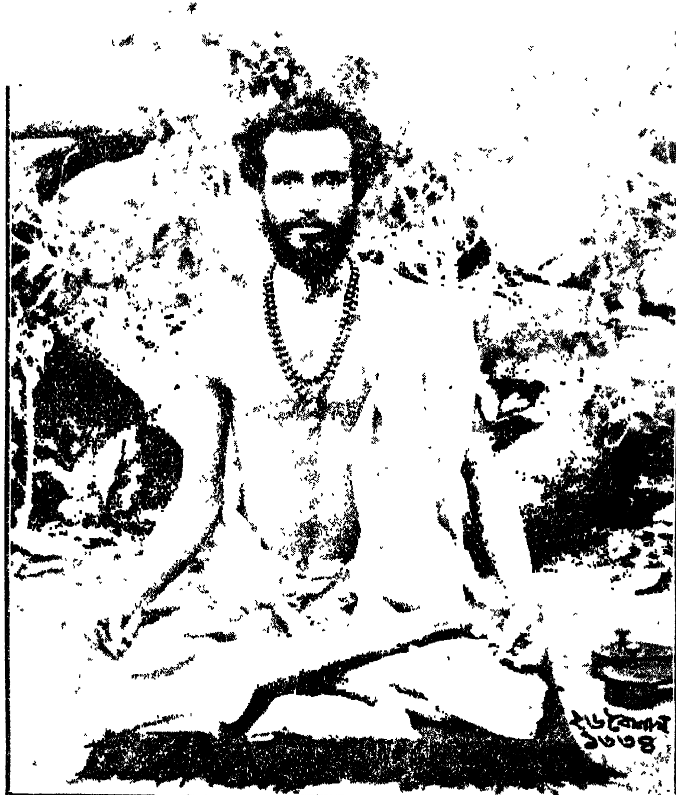
২৯৫।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। শ্রীমনোমোহন সাহা,

২০, রহমৎগঞ্জ (ওয়াটার ওয়ার্কস্ রোড), ঢাকা।

Printed by—**Pyari Mohan Kar.**

Victoria Art Press, 8, Haranath Ghosh Lane, Dacca.



শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

নিবেদন

পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস আকুমার ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারক সন্ন্যাসী। অকালবীর্য্যক্ষয়রূপ যে বংশনাশক মহাপাপ অসৎসংসর্গের দুর্য্যোগে বালক ও কিশোরদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে গোপনে জাতীয় মৃত্যু আহরণ করিতেছে, তাহার সমূল প্রতিকারই স্বামিজীর জীবনের ব্রত। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অকৃতদার যুবকদের মধ্যে সংযম, সদাচার ও সৎসঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠার্থ প্রাণপণ যত্ন পাইয়া আসিতেছেন। ফলে দেশব্যাপী এক বিরাট ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন দিনের পর দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া জাতীয় জীবনকে শোভাদীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। দেশের যুবক সম্প্রদায়ও তাহাদেরই-জন্য উৎসর্গীকৃত-জীবন এই পরমবান্ধব সন্ন্যাসি-মহাত্মার বহু-বৎসর-ব্যাপী সুকঠোর শ্রমের ফলে জানিয়াছে যে, অসংযম-দাবানলে দগ্ধপ্রায় জীবনকেও উন্নতির পথে পরিচালনা করা আকাশ-কুসুম নহে, তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, কামের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম হইয়া যাহারা জীবনকে দুর্ব্বহ ও মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করিতেছে, ভগবানের অফুরন্ত কৃপা তাহাদেরও জন্য বর্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যে-সকল যুবক কুমার অবস্থায় শ্রীমৎ স্বরূপানন্দের অমৃতময়ী উপদেশ-বাণীতে সঞ্জীবিত হইয়া জীবন-গঠনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সম্প্রতি গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিবাহিত জীবনকে সংযত ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টিত আছেন। ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করাও হইবে না যে, শ্রীশ্রী স্বামীজীর কৃপাশ্রয় পাইবার পর বাংলা, বিহার ও আসামে অসংখ্য দম্পতী সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া সম্ভোগ-লিপ্সা-হীন মধুময় দাম্পত্য জীবন যাপন করিতেছে। তাঁহাদেরই হিতকল্পনায়

পূজনীয় গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন কিন্তু যাঁহারা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে জীবন গঠনের প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারাও বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" শব্দদ্বয় "সোণার পাথর বাটী" বা "কাঁঠালের আমত্বের" ন্যায় একটা নিরর্থক কথা। অনেকের বিশ্বাস, বিবাহিত জীবন শুধু ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্সা পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, ইহার অপর কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতে পারে না। পূজনীয় গ্রন্থকার নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, বিবাহ করিয়া সংযম-সাধনা অসম্ভবও নহে, অস্বাভাবিকও নহে এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে অসংযমাসক্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ-লুব্ধ কামান্ধ নরনারীরাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংযম-চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারেন, তাহার সহজতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মিসমাজে শ্রীমৎ স্বরূপানন্দের এক অসামান্য কৌলিন্য আছে। ইহার কারণ এই যে, নবজাগ্রত ভারতবর্ষের কর্ম্ম-সাধনার ইতিহাসে তিনি এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আদর্শ অভিক্ষার। এত কাল সকল স্বদেশকর্ম্মী দেশবাসীর দুয়ারে দুয়ারে চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন—তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রুদ্রকণ্ঠে বজ্রনাদে কর্ম্মসাধকের এই আত্মাবমাননার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ব্যক্তির জীবনে দৈবের অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবে পুরুষকার।" ঘোর গর্জ্জনে তিনি বিঘোষিত করিলেন,—"অভ্যুদয়কামী ভারতবর্ষ!

সর্ব্বাগ্রে তুমি ব্যক্তি-জীবনে এবং সঙ্ঘ-সাধনায় ভিক্ষাবৃত্তিকে বর্জ্জন কর, চাঁদার খাতা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেল, ভিক্ষার ঝুলি চুল্লীর আগুনে নিক্ষেপ কর।" আদর্শ-মুগ্ধ শিষ্যদের কাণে তিনি শুনাইলেন,—"পরমুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, পর-প্রদত্ত পায়সান্নের দ্বারা শরীরের চর্ব্বি না বাড়াইয়া নিজ ভুজবীর্য্যলব্ধ ক্ষুদের কণার উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশ অকাতর চিত্তে দরিদ্র-নারায়ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া নিকৃষ্ট অবশিষ্টাংশ দ্বারা কোন ক্রমে তনু রক্ষা করিতে হইবে।" এই সকল কথা মুখে বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবন-ব্যাপী কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়া কথাগুলিকে কার্য্যেও পরিণত করিয়াছেন। কত অভিশপ্ত তরুণের চিত্তে তিনি আশার কিরণ ঢালিয়াছেন, কত অলসকে তিনি কর্ম্ম-জীবনে দীক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু কেহ এজন্য তাঁহাকে একবারের জন্যও কখনও ভিক্ষা করিতে দেখে নাই,—যাহা করিতে দেখিয়াছে, তাহার নাম অনশন এবং পরিশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে বলিয়া একদিনের তরেও তিনি কাহারও নিকটে অনুগ্রহের প্রার্থনা লইয়া অগ্রসর হন নাই, আর্থিক সাহায্য পাইবার জন্যও বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন করিয়া কাহারও কাণের পোকা তিনি বাহির করেন নাই, ধনীর মনকে অনুরোধ-উপরোধের বিড়ম্বনায় ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া তাহার বদ্ধমুষ্টি গলাইয়া টাকার তোড়া বাহির করিবার ফিকিরে কখনও তিনি কাহারও দুয়ারে মাসে চারিবার করিয়া ধন্না দেন নাই,—পরন্তু ধনীর ধনের কল্পনা ছাড়িয়া নিজের বাহুবলকে তিনি প্রত্যেকটি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মুষ্টিভিক্ষা না তুলিয়া মাসে মাসে অসংখ্য রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করা যাইতে পারে, কদন্ন-ক্লিষ্ট ও অর্দ্ধাহার-শীর্ণ কর্ম্মিরাও জনসাধারণের মধ্য হইতে

চাঁদা না তুলিয়া সৎসঙ্কল্প-সুদৃঢ় বজ্রবাহুর পীড়নে প্রস্তর-কঠোর আরণ্য ভূমিকে আয়কর আবাদে পরিণত করিতে পারে, বিনা বেতনে বালকগণকে বিদ্যা দান করিতে পারে, আশ্রমের ব্যয়ে শত সহস্র ফলকর বৃক্ষের চারা উৎপাদন করিয়া অকাতরে তাহা গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে বিতরণ এবং গৃহে গৃহে রোপণ করিতে পারে, জেলাবোর্ড, লোকেল-বোর্ড বা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীতই গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট ও কূপাদি নির্ম্মাণ সম্ভব করিতে পারে।

"পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম" তাঁহার এই অভিক্ষা-সাধনার একটী সিদ্ধপীঠ। অপ্রার্থিতভাবে পুপুন্‌কীর উদারচেতা ভূস্বামী শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র, হরিহর মিশ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ একশত বিঘা আরণ্য ভূমি স্বামীজীর হস্তে দিয়াছিলেন, আজ তাহা সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগের মধ্যে একটি বিখ্যাত স্থানে পরিণত হইয়াছে, কোনও কোনও বিদ্যালয়-পাঠ্য ভূগোলগ্রন্থে পর্য্যন্ত ইহার কথা মুদ্রিত হইয়াছে। **"পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম"** পুরুলিয়া, হাজারিবাগ, রাঁচি, ধানবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানের কেন্দ্রস্থলে রমণীয় বন-ভূমিতে অবস্থিত। মহুয়া-তলে বা আম্রচ্ছায়ায় বসিয়া যখন বিদ্যার্থী ব্রহ্ম-চারীদিগকে অধ্যাপনা করা হয়, তখন সুদূরের পরেশনাথের পাহাড় প্রভৃতির মনোরম দৃশ্য চিত্তকে এক আনন্দরসে আপ্লুত করে। আশ্রমে বর্ত্তমানে সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী, নানাবিধ হস্তশিল্প, কৃষি ও **ইন্দ্রিয়-সংযম** শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ধীরে ধীরে আশ্রম হইতে নিম্নলিখিত চেষ্টা সমূহ পরিচালনের সঙ্কল্প করা হইয়াছে। যথা—

(১) যাঁহারা অসংযত জীবন যাপনের ফলে যৌবন বিকাশ কাল উত্তীর্ণ না হইতেই স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্বলাভে হতাশ হইয়াছেন, যৌগিক সাধনা ও সদাচারেরর মধ্য দিয়া তাঁহারা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন,

আশ্রম মধ্যে তেমন সুযোগ দান করা। (২) একদল চরিত্রবান বীর্য্যশালী ত্যাগী কর্ম্মীর সঙ্ঘগঠন করিয়া দেশব্যাপী এবং দেশকালোপযোগী ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মমূলক উদার সুশিক্ষা প্রচার করা। (৩) দীন-দরিদ্রের তীক্ষ্ণধী সন্তানদিগকে এবং পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকগণকে আশ্রমের ব্যয়ে সংযমমূলক ও সদুপায়ে গ্রাসার্জ্জনক্ষম সুশিক্ষা প্রদান করা। (৪) আশ্রম-সম্পর্কিত আরোগ্য-শালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাদ্বারা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের সেবা করা এবং আশ্রমীয় বিদ্যার্থি-গণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

আমরা নিশ্চিত জানি, ভগবান আমাদের এই কল্যাণ প্রয়াসের সহায় হইবেন। ইতি চৈত্র, ১৩৩৪ বাং

পুপুন্কী অযাচক
ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম
পোঃ—চাশ, মানভূম
বিহার প্রদেশ

নিবেদক—
শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীধীরব্রত ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের ছয় মাস মধ্যেই এক সহস্র খণ্ড নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে পুপুন্কী আশ্রমে দারুণ অর্থশোষ চলিয়াছে। এমন কৃচ্ছ্র যাইতেছে যে, অর্থাভাবে তিনমাস কাল শ্রীশ্রীস্বামীজী এবং তাঁহার কর্ম্মীদিগকে অধিকাংশ সময়ে শুধু গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া প্রাণধারণ করিতে হইয়াছে। তাই গ্রন্থ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ আর সঞ্চয় করা যায় নাই,

পুপুন্‌কী আশ্রমেই ব্যয়ের জন্য ত্বরিত প্রেরণ করিতে হইয়াছে। অযাচকের প্রতিষ্ঠান, ভিক্ষা চাহিয়া চালান হয় না, অর্থাগমের সুষ্ঠু কোন সদুপায়ও হাতে আসে নাই। ফলে একমাত্র অর্থাভাবেই এই ছয় বৎসর কাল এই গ্রন্থ অমুদ্রিত রহিল।

অথচ বাজারে এই পুস্তকের যথেষ্ট চাহিদা আছে। গুণ-মুগ্ধ পাঠকেরা কলিকাতার সমস্ত পুস্তকালয়ে এই গ্রন্থ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পুস্তকাভাবহেতু সর্ব্বত্র হতাশ হইতে থাকিলেন। চতুর একব্যবসায়ী সুযোগ বুঝিলেন। ঠিক্ "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" নামটী দিয়াই তিনি এক গ্রন্থ লিখিলেন, যাহার মূল তত্ত্ব, লক্ষ্য ও প্রকরণ শ্রীমৎস্বরূপানন্দ প্রণীত গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

বলা বাহুল্য উক্ত গ্রন্থ জন-সমাজে আদৌ সমাদৃত হয় নাই, কারণ শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ প্রণীত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থে ভারতীয় জাতির পুনর্গঠনমূলক যে সকল অমোঘ ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা সত্যদ্রষ্টা ঋষির পদপ্রান্তে বসিয়াই অবনত অধঃপতিত জাতি শিক্ষা করিবে, চতুর ব্যবসায়ীর নিকট নহে। শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ সমগ্র জীবন দিয়া নিজে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন, সমগ্র শক্তি দিয়া দেশব্যাপী অসংযমের প্রতীকার কল্পে এক যুগের অধিক কাল ধরিয়া রণবাহিনী পরিচালন করিয়াছেন, অসংখ্য ভোগসুখী দম্পতীর জীবনে সংযমের শান্তি-সুরভিত অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছেন এবং পুস্তক বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়া জাতিকে তেজস্বী, বলিষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার সকল অমানুষিক কর্ম্মোদ্যমের মূলীভূত লক্ষ্য। তপস্বীর জীবন্ত মনীষা জীবকল্যাণার্থে যাহা প্রসব করিয়াছে, ব্যবসায়ীর চতুরতা তাহার শ্লাঘনীয় গৌরব কখনই অপহরণ করিতে পারে না।

এই গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় যাঁহারা হতাশ হইয়াছিলেন, এতদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া ধরিতে পারিয়া আমরা আনন্দানুভব করিতেছি। এই সংস্করণও অচিরকাল মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থ বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল এবং একটী মূল্যবান্ ও চিত্তাকর্ষক পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল। কিন্তু তজ্জন্য গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। আশা করি, এই গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ দশ জন করিয়া বিবাহিত পুরুষ বা নারী বন্ধুকে এই গ্রন্থখানা পাঠ করিতে উৎসাহিত করিবেন। ইতি— মাঘ ১৩৪০

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" দ্বিতীয় সংস্করণ আট মাস সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা অনুধাবিত হইবে। এইবারও গ্রন্থ অনেক বাড়িল, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **"আনন্দ-বাজার পত্রিকা"** বলেন,—

"বর্ত্তমান সময়ে যৌন সাহিত্যে নানা গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। কিন্তু প্রায়শঃই সেগুলি সৎসাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় নাই—দম্পতি-জীবনকে উন্নত করিয়া নরনারীকে সাধনার পথে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা

লিখিত। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। যৌন-রহস্য অবলম্বন করিয়া লেখক মনুষ্যজীবনের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক নিজে ব্রহ্মচারী এবং সাধনা-মার্গের পথিক। আধুনিক চিন্তার ধারার সহিত তিনি পরিচিত। তাঁহার মতামতগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত। বিবাহিত জীবন যথাযথ প্রতিপালিত হইলে বংশের উন্নতি ও জাতির কল্যাণ যে সাধিত হইবে—এই গ্রন্থে সেই বাণী তিনি প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে "দৈনিক বসুমতী" বলেন,—

"ভাবের স্বচ্ছতায়, আলোচনার সরসতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও কল্যাণবুদ্ধির প্রাচুর্য্যে এই গ্রন্থখানা অপূর্ব্ব। অতুলনীয় কৃতিত্ব সহকারে গ্রন্থকার সমগ্র জাতিকে শাস্ত্রসঙ্গত সংযমের পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবাহিত ও বিবাহার্থী নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে এই গ্রন্থে প্রভূত মনোবল ও উৎসাহ লাভ করিবেন। ভোগসর্ব্বস্ব সমাজে সংযমের প্রতিষ্ঠা সাধনে এই গ্রন্থ প্রচুর সহায়তা দিবে।"

কাছাড়-শিলচর হইতে জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থ আমার অমাচ্ছন্ন জীবনে আশার কিরণ ঢালিয়া দিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় ব্যক্তিই একমাত্র স্ত্রী-সান্নিধ্যে থাকিয়া সংযম রক্ষা করিতে সমর্থ, অপরে ইহা কখনো সম্ভব নহে, আমার এই ধারণা ছিল। তাই সংযত হইতে

চাহিয়াও সংযম রক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠের পরে সহধর্ম্মিণীকে গ্রন্থের প্রত্যেকটা পাতা পড়িয়া বুঝাইলাম, তাহাকে আমার মতাবলম্বিনী করিতে চেষ্টা পাইলাম, পুণ্যে উৎসাহ ও পাপে বাধা দিবার জন্য তাহাকে বারংবার দৃঢ় হইতে বলিলাম। দুই চারিবার তথাপি পদস্খলিত হইতে হইল। কিন্তু এই গ্রন্থের কৃপায় বিগত এক বৎসর কাল আমরা সস্ত্রীক একত্র বাস করিয়াও সংযম পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারিতেছি। আমার মত নারকীয় কীট যখন সফল হইয়াছে, তখন অপর লোকে কেন পারিবে না ?"

সংযুক্ত-প্রদেশ-প্রবাসী জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"বহুসন্তান-পরিবৃত সংসারের দায় হইতে বাঁচিবার জন্য চেষ্টা কম করি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জন্মশাসনের যত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সব পরীক্ষা করিয়াছি এবং সবই নিষ্ফল হইয়াছে। আপনার গ্রন্থ পড়িয় মনে হইল, ভগবানকে সস্ত্রীক ডাকিয়া দেখিই না, কি ফল হয় ! দেখিলাম, সস্ত্রীক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই সংযম লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা। বিদেশী জন্ম-নিরোধের কৃত্রিম আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে প্রাচীন ভারতের ঋষি-প্রণীত পন্থার শ্রেষ্ঠতা আস্বাদন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।"

স্বাধীন-ত্রিপুরান্তর্গত কৈলাসহর হইতে জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশানুযায়ী আমরা স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেহ এক সময়ে একসঙ্গে ভগবদুপাসনায় বসিয়া থাকি। দুই তিন মাসেই চিত্তে যে পবিত্রতা অনুভব করিতেছি, তাহাতে দৃঢ় ধারণা হয় যে, দৃঢ়তার সহিত চলিলে আমৃত্যু সংযমী থাকাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে।"

তৃতীয় সংস্করণ অত্যন্ত দ্রুত মুদ্রণ করিতে হইয়াছে বলিয়া মুদ্রাকর-প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। পাঠক-পাঠিকারা এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি—ফাল্গুন, ১৩৪১

উৎসর্গ

যাঁহার ন্যায় তপস্বী, পূতচরিত, পরহিতব্রত মহাপুরুষের
পুরুষানুক্রমিক সাধনায় পুষ্ট গৌরবময় সুপবিত্র বংশে
জন্মগ্রহণ না করিলে আমি বর্ত্তমান সৌভাগ্যান্বিত
আনন্দময় জীবন লাভ করিতে অসমর্থ হইতাম,
যাঁহার জীবনের অতুলনীয় পরার্থপরতা,
ভগবদ্‌ভক্তি ও অসাম্প্রদায়িকতা আমার
সমগ্র জীবনের ভিত্তিমূল সুদৃঢ়
করিয়াছে,
পরমহংস শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ যাঁহাকে
"কলিযুগের বশিষ্ঠ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন,
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁহাকে পিতৃতুল্য
জ্ঞান করিতেন,
রাজর্ষি জনকতুল্য ব্রহ্মজ্ঞ ও
ভক্তরাজ প্রহ্লাদতুল্য প্রেমিক,
সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা
পরম-পূজনীয় পিতামহদেব
শ্রীযুক্ত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়
মহাশয়ের শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিভরে
উৎসর্গীকৃত হইল।

ইতি—

দোলপূর্ণিমা
১৩৩৩

প্রণত
গ্রন্থকার



নিত্যধামগত গৃহস্থ যোগী
হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

ওঁ

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

উপক্রমণিকা

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পক্ষে সর্ব্বথা মৈথুন-ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার অযথা-মৈথুন ত্যাগ-ই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য। চির-কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বীরা নিবৃত্তিপন্থী সাধক, বিবাহিত ব্যক্তিরা প্রবৃত্তিপন্থী সাধক। উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু উভয়ের ব্রহ্মচর্য্যে পার্থক্য আছে। গৃহত্যাগীর ব্রহ্মচর্য্যে সর্ব্বপ্রকার মৈথুন-ই সর্ব্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যে মৈথুন নিষিদ্ধ নহে কিন্তু মৈথুনের এই অনুমতির চতুর্দ্দিকে বহু নিষেধের কণ্টক-বেষ্টনী রচিত হইয়াছে। এই সকল নিষেধ গৃহীকে মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা বিবাহিত ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা হইবে না। বলা প্রয়োজন, পুনর্ব্বিবাহে অনিচ্ছুক চরিত্রবান বিপত্নীক ও সুচরিতা বিধবাকে এস্থলে আমরা গৃহত্যাগীর পংক্তিভুক্ত করিতেছি।

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহত্যাগীর ব্রহ্মচর্য্য

সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য একাকী-সাধ্য। কিন্তু গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য যুগলে সাধ্য। যখন যেরূপ আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রতিপালন আবশ্যক, বিশ্বসংসারের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য

রক্ষার্থ তখনই সেইরূপ আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠার অনুশীলন করিতে পারেন। কিন্তু গৃহীকে সংসার পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না, স্বামীর পক্ষে পত্নীকে এবং পত্নীর পক্ষে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষণের চেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গতও হইবে না। বিশেষতঃ সন্ন্যাসী ও গৃহীর কল্যাণ-লাভের এবং কল্যাণ-বিতরণের প্রণালীগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই জন্যই গৃহীর পক্ষে গৃহত্যাগীর ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর আদর্শ গ্রহণ করা যেমন নিরর্থক, সন্ন্যাসীর পক্ষেও তেমন সংসারসেবীর ব্রহ্মচর্য্যের সীমাবদ্ধ আদর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়াস ব্রতনাশক। যদি বাহিরের দিক্ হইতেই সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্যকে দেখিতে চাহি, তাহা হইলেও এই এক বিরাট প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় যে, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট তপঃশক্তি দ্বারা সন্ন্যাসী যখন প্রত্যক্ষভাবেই সমগ্র দেশ, জাতি বা সমাজের উপর এমন কি সমগ্র জগতের উপর কল্যাণ-প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট দেহ-ক্ষয়ের দ্বারা সিংহবীর্য্য সন্তান উৎপাদন করিয়া গৃহী তখন প্রত্যক্ষভাবে শুধু একটি পরিবারেই কল্যাণ বাড়াইতেছেন এবং দেশ, জাতি বা সমাজের ও জগতের কল্যাণ অপেক্ষাকৃত পরোক্ষভাবেই সাধন করিতেছেন। সন্ন্যাসীর জীবন-সাধনায় জগৎ মুখ্য, সাম্প্রদায়িক গণ্ডী গৌণ; গৃহীর জীবন-সাধনায় নিজ পরিবার মুখ্য, জগৎ-সমাজ কথঞ্চিৎ গৌণ। তাই সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব বিশ্বজগৎকে লাভবান করিয়া গৃহে গৃহে সম্পদ বাড়ায়, আর গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব নিজ নিজ গৃহকে সমৃদ্ধ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার ব্যাস ও পরিধিকে বিস্তারিত করে এবং এই ভাবেই জগৎকে লাভবান্ করে। যেখানে সন্ন্যাসীর

একটী যুগলে সাধ্য, অপরটী একাকী সাধ্য

সন্ন্যাসী ও সংসারীর কল্যাণ লাভ ও বিতরণে পার্থক্য

সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য লক্ষ্য জগৎ, গৃহীর ব্রহ্মচর্য্যে মুখ্য লক্ষ্য পরিবার

মনটী-ই শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে বিস্তৃত হইতেছে এবং শত শত দেহের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, সেখানে গৃহীর দেহটী-ই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রসারিত হইতেছে এবং পরাক্রান্ত সদৃশ মনসমূহকে ধারণ করিবার জন্য আধার নির্ম্মাণ করিতেছে। একের জীবন-ভঙ্গীর সহিত অপরে তাহার জীবন-ভঙ্গীর পার্থক্যটুকু ষোল আনা রক্ষা করিয়াই পরস্পরের সহযোগিতায় জগতের মঙ্গলকে জাগ্রত করিতেছে। সন্ন্যাসী জগৎকে কল্যাণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া এবং সকল আকাঙ্ক্ষার পরমপরিতৃপ্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত ; পরন্তু, যেমন বংশধর বা বংশধারিণী সহজে কল্যাণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে, আদর্শ-ধারণে সমর্থ হইবে এবং পরম পরিতৃপ্তির পথে নির্ভুল পাদসঞ্চারে চলিতে চেষ্টা করিবে, এমন সন্তান-সন্ততির আগমনের পরে গৃহী নিশ্চিন্ত। জগৎকে শিক্ষা দিবার যোগ্যতা সঞ্চয়ের জন্য সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য, আর, জগৎকে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য করিবার জন্য গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য। শিক্ষাদানের যোগ্যতা-সঞ্চয় সন্ন্যাসীর একক চেষ্টার অপেক্ষা রাখে, কিন্তু শিক্ষাগ্রহণক্ষম সন্তানের জনন-কার্য্য একমাত্র পিতা বা একমাত্র মাতার দ্বারা হইতে পারে না, ইহাতে দম্পতীর পরস্পরের শুভেচ্ছা-প্রণোদিত পরিপূর্ণ সাহচর্য্য আবশ্যক। এই জন্যই গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য কখনই একাকী সাধ্য নহে, যুগলে সাধ্য।

উভয়ের ব্রহ্মচর্য্যই উদ্দেশ্যত: সহযোগিতামূলক

যেরূপ শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর বৈবাহিক মিলনে দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন সহজে সম্ভবপর, বর্ত্তমান যুগে সহস্র সহস্র বিবাহে দুই একটী স্থলেও তেমন যুবক-যুবতীর মিলন হইতেছে কিনা, তাহা অতিশয় সন্দেহ-সঙ্কুল কথা। এই যে যোগ্য এবং যোগ্যার মিলন হইতেছে না, ইহা হইতেই বর্ত্তমান কালে পারিবারিক

যোগ্য-যোগ্যার অমিলনই পারিবারিক দুর্গতির মূল

জীবনের প্রায় সকল দুঃখ, দুর্গতি ও দুর্দ্দশার উদ্ভব হইতেছে। যেদিন পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র কিশোর ও কিশোরীদের জন্য একই

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

আদর্শে পরিচালিত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত না হইবে এবং আশ্রম হইতে দেহ, মন ও আত্মার বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া তারপরে বরকন্যা সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল দুর্দ্দশা ও দুর্গতির সমূল প্রতিকার অসম্ভব। দেশজোড়া স্কুল-কলেজ খুলিয়া বি-এ এম-এর হাট আমরা বসাইতে পারি, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবল আন্দোলন চালাইয়া অন্তঃপুরাবদ্ধা নারীদিগের পথে-ঘাটে স্বতন্ত্রভাবে চলিবার অধিকারও দিতে পারি, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বালক এবং বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার মধ্য দিয়া একটা সর্ব্বজয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া উভয়ের রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ্যকে সেই আদর্শের অনুযায়ীভাবে গঠন করা না যাইবে, ততদিন গৃহি-জীবন কিছুতেই সুখের হইবে না, ততদিন বিবাহিত জীবনে কিছুতেই শান্তি আসিবে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সমূহ

প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থাসমূহ এখনও দেশ মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণে যে-সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেইগুলির এবং স্বদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন সম্বন্ধে অন্ধতামূলক উপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসমূহের প্রতিষ্ঠার প্রবল অন্তরায়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তথাপি, যাঁহারা এই কর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, অস্থিবিক্রয় করিয়া হইলেও তাঁহারা কালক্রমে ইহা করিয়া

তবে ছাড়িবেন। এদিকে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের গগনে সার্ব্বজনীনভাবে ব্রহ্মচর্য্যের প্রদীপ্ত-ভাস্কর উদিত না হইতেছে, তাবৎ কাল অসমরুচি, অসমপ্রকৃতি ও অসমসামর্থ্য দম্পতী-দিগকেও সংযমসাধনা ও পারস্পরিক সহায়তার মধ্য দিয়া জীবন পরিচালনা করিতে যত্ন পাইতে হইবে।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কি কর্ত্তব্য এবং তাহার সুফল

সকলে-ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিতে সমর্থ না হইতে পারে, কিন্তু অকপটতার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের এই চেষ্টা সন্তান-সন্ততির কুমার-কুমারী-জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় এবং বিবাহিত জীবনে বিধানানুযায়ী শিষ্টসম্মত সংযমরক্ষায় সাহায্য করিবে। বর্ত্তমান বিবাহিত মানব-মানবীরা যাহাতে সংসারের সুখ হইতে বিষটুকু বিনষ্ট করিয়া অমৃতটুকু গ্রহণ করিতে পারেন এবং সন্তান-সন্ততির জীবন হইতে বিষ-সঞ্জননের সম্ভাবনা হ্রাস করিয়া অমৃত-সঞ্জননের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দিতে পারেন, তজ্জন্য বিবাহিত দম্পতীদের কল্যাণ-কল্পে কতিপয় বিষয় এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শতশত কথা ভাবিবার, বুঝিবার এবং বলিবার রহিয়াছে। হে চিন্তাশীল এবং সাধনপরায়ণ ভাগ্যবান মানব-মানবীবৃন্দ! তোমরা আজ ধ্যানলব্ধ প্রশান্ত প্রজ্ঞার বলে সেই সকল অকথিত বিষয়ের অনুধাবনা করিয়া জীবনকে কল্যাণবন্ত করিয়া লও। গ্রন্থপাঠ তোমাদের রুচিকে সংযমাভিমুখিনী করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে সংযমে প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ভোগলালসার প্রসুপ্ত লেশটুকুকে পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার ক্ষমতা তোমাদেরই নিকটে রহিয়াছে।

বিবাহের অভিব্যক্তি

অভিধানে যতগুলি শব্দের তালিকা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ভাগ্যেই এমন একটা সময় গিয়াছে, যখন সেই শব্দের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। আবার প্রত্যেক শব্দেরই অর্থের রূপান্তর সময় হইতে সময়ান্তরে হইয়া আসিতেছে। "বিবাহ" শব্দটীও সেই ভাগ্যটীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। অর্থাৎ, এমন একটা সময় ছিল, যখন "বিবাহ" নামে কোনও শব্দ আদৌ প্রচলিত ছিল না। আবার, "বিবাহ" শব্দটীর প্রচলনের পরেও বিভিন্ন সময়ে ইহার অর্থ বিভিন্ন-রূপ হইয়াছে। আগামী যুগেও নানা সময়ে ইহার অর্থ দিনের পর দিন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

বিবাহের অর্থ

যে সময়ে 'বিবাহ' বা তদ্বোধক কোনও শব্দের প্রচলন ছিল না, সেই যুগে মানবমানবীর যৌনসম্মিলন ব্যাপারটা পশুপক্ষীদের সম্মিলনের ন্যায়ই নিতান্ত সাধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধ-বর্জ্জিত ছিল। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মানব যেমন জানিতে পারে না যে, সে প্রাণায়ামই করিতেছে, ঠিক তেমনি মিথুনীভূতভাবে সম্মিলিত হইয়াও মানব-মানবী জানিত না যে, তাহারা অপত্যোৎপাদনই করিতেছে। সন্তানের জন্মের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা মানবজাতির সম্ভবতঃ সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়াই ছিল। যৌন সম্মিলন তখন সুখলিপ্সাতৃপ্তির উপায় ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং এই তৃপ্তি খুঁজিতে যাইয়া মানব-মানবী রক্তমাংসের

বিবাহের আদিম রূপ

কোনও প্রকার নৈকট্যকেই অলঙ্ঘনীয় মনে করিত না, জন্মগত কোনও প্রকার সম্পর্কেরই বিচার রাখিত না। সুখের তৃষ্ণা যাহাকে যাহার সন্নিকট করিত, সে তাহারই সংসর্গ করিত, একই পুরুষ বা নারী রতিসুখপ্রণোদিত হইয়া যে-কোনও নারী বা পুরুষের কিম্বা বহু নারী বহু পুরুষের সংসর্গ অবাধে বা অকুণ্ঠিত চিত্তে করিত। সমাজ তখনও গড়িয়া ওঠে নাই বলিয়াই নারী বা পুরুষ কাহারও পক্ষেই দৈহিক একপরায়ণতা আবশ্যকীয় বলিয়া অনুভূত হইত না।

যতদিন মানুষ নিজ জন্মের কারণকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে নাই, ততদিন যদিও কোন সামাজিক ভাবের উন্মেষ হইয়াই থাকে, তবে তাহা পশুপক্ষীর সমাজ অপেক্ষা বড় উন্নত শ্রেণীর ছিল না। কিন্তু যখন মানুষের জ্ঞানের প্রসার হইল, মানবী যখন প্রসূত সন্তানের জনককে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইল এবং বীর্য্যাধানকারক মানব যখন নিজেকে সন্তান-জননের কারণ বলিয়া মনে করিতে শিখিল, তখন হইতে সমাজের বন্ধনরজ্জু প্রকৃতি-মাতার অদৃশ্য হস্তে পাকান হইতে লাগিল। প্রথমতঃ জননীকে সকলের জন্মের কেন্দ্র জানিয়া বহুপিতৃজাত সন্তানেরা একরূপ মাতৃগত সমাজ গড়িয়া তুলিল। পরবর্ত্তী কালে জনককে সকলের জন্মের কেন্দ্র জানিয়া বহুমাতৃজাত সন্তানগণের আর একরূপ পিতৃগত সমাজ গড়িয়া উঠিল। নারীর উপরে পুরুষের অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মাতৃগত সমাজের প্রসার-পদ্ধতি পিতৃগত সমাজের প্রসার-পদ্ধতির কাছে পরাভব স্বীকার করিল এবং একটীমাত্র পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই বহুনারীর সন্তানসন্ততিরা পরস্পর মিলিয়া সমাজকে গঠিত, শাসিত ও সম্প্রসারিত করিতে লাগিল।

সমাজ-বন্ধনের প্রথম রজ্জু

ভারতীয় আর্য্যসমাজে মহামনা শ্বেতকেতু সমদর্শিতা-প্রেরিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সীমানির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। "শ্বেতকেতু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্য হইতে যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা-সদৃশ পাতক হইবে। অপিচ, এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ কৌমার-ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে।" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২ অঃ)

শ্বেতকেতুর অপক্ষপাত সীমা-নির্দ্দেশ

তাঁহার অনুশাসনের মর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে ধীরে ধীরে মাতৃগত ও পিতৃগত উভয়বিধ সমাজধারা শুষ্ক হইয়া একমাতা ও একপিতার সাম্যমূলক সম্মিলনে উদ্ভূত পৃথক সমাজধারা প্রবাহিত হইত। কিন্তু শ্বেতকেতুর সীমা-নির্দ্দেশের ফলে নারীর একপরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পুরুষের বহুপরায়ণতা নিবারিত হইল না। কারণ, পুরুষেরা শ্বেতকেতুর নির্দ্দেশ মানিল না। দীর্ঘতমা প্রভৃতি একদেশদর্শী পক্ষপাতী ঋষিরা পুরুষের আচরণ নিয়মিত করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া মাত্র নারীর বহুপরায়ণতাই রোধ করিলেন। "একদা দীর্ঘতমা ভার্য্যাকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া কহিলেন যে, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? ভার্য্যা প্রদ্বেষী কহিলেন,—স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায় এবং পালন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকে। হে মহাতপ! আমি চিরকাল তোমার জন্মান্ধতা-প্রযুক্ত তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রমাতুরা হইয়াছি, এক্ষণে আর ভরণ করিতে পারিব না।...... তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর ভরণ পোষণ

দীর্ঘতমার পক্ষপাত-মূলক সীমানির্দ্দেশ

করিতে সমর্থ নহি। দীর্ঘতমা কহিলেন,—আমি অদ্য হইতে এইরূপ লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলাম যে, নারী যাবজ্জীবন একমাত্র পতিপরায়ণা হইবে। সেই একমাত্র স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, নারী অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই নারী পতিতা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব)।

ইহাতে কিছু সুফল হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু নরনারী উভয়ের দায়িত্বের ও অধিকারের সমতা না থাকিলে যে বিশৃঙ্খলা জন্মে, তোষাখানার সিংহদুয়ার বন্ধ রাখিয়া পিছদুয়ার খুলিয়া রাখিলে রাজকোষের যে অনর্থক অপব্যয় হয়, একজনকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়া আর একজনকে অন্ধকারায় রুদ্ধ করিলে যে বিষম দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক অধোগতি হয়, তাহাদেরই দুঃখদ তাড়না বর্ত্তমান যুগের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল। ইহার ফলে এবং অন্যান্য কয়েকটী কারণে পুরুষের বহুবিবাহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আদর্শ হিসাবে পুরুষের একপরায়ণতা আজও অনেকটা কল্পনারই বস্তু হইয়া রহিয়াছে। আর্থিক অভাব না থাকিলে আজও অনেকেই একাধিক বিবাহ করিতে লজ্জাবোধ করে না বা বহুবিবাহের জন্য নিজদিগকে ধিক্কারযোগ্য মনে করে না।

বিদ্যাসাগরের সুবিচার-চেষ্টা

সামাজিক জীবনের পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিকথাটুকু মনে রাখিলেই সহজে বুঝা যাইবে যে, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় "বিবাহ" কথাটার কিরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। যতদিন নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই,

ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ "বন্ধনের"ও সৃষ্টি হয় নাই। কারণ, সন্তান-জননের জন্য বিবাহ অপরিহার্য্য নহে, বিবাহ ব্যতীতই মানবের জন্মধারা আদিকাল হইতে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু যখন হইতে প্রসূত সন্তান জনক-জননীকে পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ স্মরণ করাইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই বিবাহটী একটী বন্ধনে দাঁড়াইল। বন্ধন যখন সৃষ্ট হইল, তখনও প্রথম সময়েই এই বন্ধন অতি সুদৃঢ় ছিল না। ধীরে ধীরে মানব-মনের ভাবোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবলতর এবং বিবাহের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। ভবিষ্যৎ কালেও আদর্শ মানবমানবীগণের মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান দিনের পর দিন আরও সূক্ষ্ম এবং বিবাহবন্ধন আরও সুগভীর হইতে থাকিবে।

ভাবী যুগের বিবাহিত জীবন

সেই সময়ে বিবাহিতের জীবন ভগবৎ-সাধনার জীবন হইবে এবং নরনারীর দৈহিক মিলন অঙ্গ-লিপ্সার মুখ না চাহিয়া আত্মিক কল্যাণের মুখ চাহিয়া চলিবে, সন্তান-জননের মধ্যেও ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। বিবাহিত জীবনের সেই সংযম-সুরভিত অকৈতব-প্রেম-মধুময় সুখ-বিলসিত সুন্দর আলেখ্য

ভাবী যুগের সূচনা

আজ পাশ্চাত্য মদিরামুগ্ধ ইহসর্ব্বস্ব ক্ষণসুখী তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষিতাদের সমাজে নিছক কল্পনার বস্তু বা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া গণিত হইলেও পল্লীমায়ের চরণসেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ নীরবে উৎসর্গ করিয়া ফল স্বরূপে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই অবগত রহিয়াছি যে, সেই মঙ্গলময় মহান্ দিনের শুভসূচনা বহু যুবকের ও বহু যুবতীর জীবনের উপরে প্রকট বিগ্রহ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—ভারতীয় দম্পতীর ভাবী দিব্য জীবন আজই নিজের পরিচয় নিজে দিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

বিবাহের অর্থ

"বিবাহ" কথাটী প্রচলিত হইবার প্রথম যুগে সকল দেশেই নরনারীর সাময়িক প্রয়োজনে পতিপত্নীভাবে একত্রে অবস্থানকেই "বিবাহ" বলিয়া গণ্য করা হইত। পরবর্ত্তী যুগে নরনারীর পতিপত্নী-ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থানকেই বিবাহ বলা হইত। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নরনারীর পতিপত্নী-ভাবে একত্র অবস্থানকে "বিবাহ" বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু আদর্শযুগে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মিলিত হইলেই "বিবাহ" হইবে না, ধর্ম্মার্থে মিলিতে হইবে; নরনারীর মিলনেই চলিবে না, এই মিলনের দ্বারা পুরুষের পুরুষত্বকে সার্থক এবং নারীর নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে; একত্র অবস্থানকেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইবে না, একের সাহচর্য্যের দ্বারা অপরের জীবনকে উন্নত এবং একের আত্মাদ্বারা অপরের আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। বিবাহের এই অপূর্ব্ব-সুন্দর আলেখ্য ভারতীয় সিদ্ধতাপসগণের মধ্যে অনেকে দর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ মানব-সন্তানগণকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছেন। এই আদর্শের সন্ধান পৃথিবীর আর কোনও দেশ সম্ভবতঃ তেমন ভাবে পান নাই। অপরাপর জাতিরা ভারতীয় আর্য্য-জাতির তুলনায় বয়সে ছোট এবং আধ্যাত্মিক সাধনার পুরুষানুক্রমিকতায় পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়া বিবাহকে নানা বিকৃত প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছেন। ভারতীয় গৃহীও যে সার্ব্বজনীনভাবে এই আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু নানা কারণে এই আদর্শকে অনুসরণ

পূর্ণতা লাভার্থ ধর্ম্মার্থে মিলিতে হইবে

করিয়া চলিবার অনুকূল অবস্থা তাহার পক্ষে সুলভ্য হইবে। সুতরাং হে ভারতীয় যুবকযুবতিগণ, তোমরা আজ বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজ নিজ সন্তানসন্ততিদিগকে পৃথিবীকে আদর্শদানের যোগ্য করিয়া তোল। তোমাদেরই হাতে আজ ভারতের তথা জগতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যতোল দুলিতেছে। তোমাদেরই বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার উপরে অনাগত মহাকর্ম্মী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমী অতিমানুষদের আবির্ভাব নির্ভর করিতেছে। তোমাদিগকে আজ আত্মবিস্মৃত হইলে চলিবে না। দেহের এবং মনের একটী মাত্র স্পন্দন এবং বিন্দুমাত্র সামর্থ্যকেও ব্যর্থ হইতে না দিয়া পরমপুরুষকার-প্রভাবে আত্মার কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য তোমরা তপঃপরায়ণ হও, সংযমনিষ্ঠ হও। অমানিশাচ্ছন্ন অমঙ্গলময় অন্ধকারা-কক্ষে আজ ভারতের অন্তরাত্মা অভ্যুদয়-লাভের আকুল আবেদনে আকাশ বাতাস মথিত করিতে চাহিতেছে,—চালাকীতে নহে, চাতুরীতে নহে, মিথ্যাশ্রয়ে নহে, অনায়াসে নহে, কঠোর তপশ্চর্য্যায়, কঠোর আত্মদানে কঠোর স্বার্থোৎসর্গে-ই তাঁর অধঃপতিত দারুণ দৈন্য-দশাগ্রস্ত দুর্গত জীবনের নবারুণোদয় ঘটিবে,—তোমাদের বিবাহ, তোমাদের দাম্পত্য জীবন, তোমাদের গার্হস্থ্য লীলা তাহারই সহায়ক হউক, তাহারই বাহন হউক।

বিবাহের উদ্দেশ্য-বিচার

মানবসমাজে বিবাহের যতগুলি উদ্দেশ্য প্রচলিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটীকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা ঃ—

(ক) ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি,

(খ) ইন্দ্রিয়-দমন,

(গ) সন্তান-জনন,

(ঘ) জীবন-সংগ্রামের দুঃখকষ্টের লঘুতাসাধন

(ঙ) ভগবৎ-সাধনা।

বিবাহের এই পাঁচটী উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী কথা আলোচনা করিতেছি।

(ক) ইন্দ্রিয়-সুখই যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য, সেখানে বিবাহ-কারীরা পশুপক্ষীরই স্থলাভিষিক্ত। কারণ, দেহ-সুখলিপ্সুর বিচার-বুদ্ধি কখনও অনুধাবনা করিয়া দেখে না যে, ইন্দ্রিয়-সুখই সুখের চরম কিনা এবং এই ইন্দ্রিয়-সুখে পরিতৃপ্তি লাভ কখনও সম্ভব কিনা।

ইন্দ্রিয়-সুখই কি সুখের চরম ?

ইন্দ্রিয়-সুখই যে সুখের চরম নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, এই জগতে শতশত মানব ইন্দ্রিয়-সুখকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সুখের আস্বাদন না পাইলে কি করিয়া তাঁহারা দেহসুখের দুর্ণিবার আকর্ষণকে দমন করিতে পারিলেন ? একটা সাম্রাজ্য না পাইলে রাজ্যকে কে উপেক্ষা করিতে পারে ? সন্দেশ না পাইয়া বাতাসা-খানিকে কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় ? এ জগতে যত জন বিবাহিত জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ভোগসুখের ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণায়

আহার্য্য এবং পানীয় না জোগাইয়া উপবাসের পর উপবাসে হত্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলেই যে-কোন মুহূর্ত্তে বিবাহিত হইতে বা অসংযম-প্রবাহে ঝাঁপ দিতে পারিতেন। অসংযমীর সংযমের পথে চলিতে বাধার অন্ত না থাকিলেও, সংযমী যদি অসংযত জীবন যাপন করিতে চাহে, তবে ত' তাহার পথে কাঁটা দিবার কেহই নাই! তথাপি বুদ্ধ, চৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিরা রমণীসুখে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন কেন? বুদ্ধদেব নারীপ্রেমের মাধুর্য্য বুঝিয়াছিলেন, গোপার গর্ভে সন্তানও উৎপাদন করিয়াছিলেন, দেহসুখ কি, ইহার আকর্ষণ কিরূপ, তাহাও জানিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন কেন? এবং ফিরিয়া আসিয়া গোপাকে লইয়া গৃহীই বা হইলেন না কেন? চৈতন্যদেবও বিবাহ করিয়াছিলেন, একটী নয়, দুইটী বিবাহই করিয়াছিলেন। নারীপ্রেমের পবিত্রতম উৎকর্ষ তিনি দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তথাপি কেন তিনি দেহসুখে মজিলেন না, বরঞ্চ চিরতরে পত্নী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন? সমস্ত জীবন বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইলেন, কিন্তু, একবারের বেশী দুইবার স্বামিদর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। ইহা হইল কেন? চৈতন্যদেব ত' সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে গৃহী করিয়াছিলেন, তিনি কি নিজে ফিরিয়া আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গসুখে দিন কাটাইতে পারিতেন না? মহাত্মা তুলসীদাস পত্নীপাগল ছিলেন, এক মুহূর্ত্তও পত্নী-বিচ্ছেদ সহিতে পারিতেন না, (তাঁহার একটী সন্তানও জন্মিয়াছিল), আর, সেই ব্যক্তিই পরবর্ত্তী জীবনে সহধর্ম্মিণীর সকল কাতরতা তুচ্ছ করিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না! পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বাল্যকালে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকগণের

স্বেচ্ছাচারে বিবাহ করিতে বাধ্য হন নাই, চব্বিশ বৎসর বয়সে নিজের ইচ্ছায় নিজনির্দ্দেশক্রমে পাত্রী নির্ব্বাচন করাইয়া তবে সারদামণি দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র জীবনে একবারের জন্যও স্বীয় পত্নীর সহিত কোনও প্রকার দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন না! বুদ্ধদেব যদি পুনরায় সংসারী হইতেন, চৈতন্যদেব যদি পুনরায় বিষ্ণু-প্রিয়া-সাহচর্য্যে কাল কাটাইতেন, তুলসীদাস যদি তাঁহার ঠাকুরের আরতির কর্পূর, তিলক-সেবার খড়িমাটি এবং মুখশুদ্ধির হরীতকীর ন্যায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীকেও ঝোল্‌নায় করিয়া লইয়া যাইতেন এবং রামকৃষ্ণদেব যদি সারদামণি দেবীকে লইয়া গার্হস্থ্য জীবন কাটাইতেন, কে তাঁহা-দিগকে বাধা দিতে পারিত? সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতি আকুমার ব্রহ্মচারীরা যদি বিবাহার্থী হইতেন, তবে কি সেই হতভাগ্য দেশে তাঁহাদের পাত্রী জুটিত না, যে-দেশে কাঁণা-খোড়া-অন্ধ-আতুরেরও বিবাহ হয়, যে-দেশে অন্নহীন বস্ত্রহীন গৃহহীন দীন-দরিদ্রেরও গৃহলক্ষ্মীর অভাব হয় না, যে-দেশে পাঁচ বৎসর বয়সে অকাল-মৃত্যু মরিয়াও সহস্র সহস্র শিশু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এড়াইয়া চলিতে পারে না? জনকগৃহে শুকদেব ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের শত উপকরণ পাইয়াও সংযমভ্রষ্ট হইলেন না, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ রূপ, যৌবন ও অর্থে সুসমৃদ্ধা মার্কিণ-যুবতীদের বিবাহের প্রার্থনাপূর্ণ মিনতি-ভরা ঘনিষ্ঠতায় টলিলেন না। ইন্দ্রিয়সংযমে এই যে অটল প্রতিষ্ঠা ইঁহারা লাভ করিলেন, তাহা কিসের বলে? ইন্দ্রিয়সুখের অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠতর

ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সুখ আছে।

সুখ আছে, তাহাতে মজিয়াছিলেন বলিয়াই মদনধনুর টঙ্কার এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহামানবদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। ইন্দ্রিয়সুখই চরম সুখ নহে এবং এই সকল মহাত্মারা প্রকৃত চরমসুখের

সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা রক্তমাংসের প্রলোভনে ভুলিয়া যান নাই।

অধিকন্তু, ইন্দ্রিয়সুখে কখনও পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে। ভোগের স্রোতে ভাসিতে গিয়া ডুবিয়াই মরিবে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার শেষ হইবে না। কামাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে যোগাইতে কামের কখনও অক্ষুধা জন্মিবে না, তাহার লেলিহান রসনা তোমাকে আরও বেশী করিয়া গ্রাস করিবার জন্য লক্ লক্ করিয়া বিস্তারিত হইবে। দশ সহস্র বৎসর যৌবন উপভোগ করিয়াও রাজা যযাতির সুখ-তৃষ্ণা উপশান্ত হয় নাই। শেষে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" যাহারা ভোগ করিয়া ভোগবাসনা কমাইতে চাহিয়াছে, চিরকাল তাহারা ঠকিয়াছে। দেহসুখের চেষ্টা করিতে করিতে যাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়াছে, ভোগের সামর্থ্য চিরতরে চলিয়া গিয়াছে, কৈ তাহারও ত' মুখে কেহ কখনও শোনে নাই যে,— "নাঃ, বেশ পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আর চাই না।"

ইন্দ্রিয়-সুখে কখনও পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥"

ইহাদের মুখে শুনিবে শুধু হাহাকার, শুধু মনস্তাপ। কেহ বলিবে,— "হায়, হায়! যৌবন চলিয়া গেল, সুখ ভোগ করিতে পারিলাম না।" কেহ বলিবে,—"অহো! আগে বুঝিলাম না, সাবধান হইলাম না, শিক্ষার অভাবে, দীক্ষার অভাবে, ভ্রমবশে চিরকাল মায়া-মরীচিকার অনুসরণ করিয়া ইহকাল নষ্ট করিলাম, পরকাল হারাইলাম।"

মোট কথা, ইন্দ্রিয়সুখ শান্তি-প্রার্থী মানব-মানবীর বিবাহের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। পরমসুখ-প্রাপ্তিই তাহাদের বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে। পরমসুখের উপাসনাকালে আত্ম-কল্যাণার্থ ও লোক-কল্যাণের জন্য নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে তাঁহারা দাম্পত্য জীবনে দৈহিক সম্বন্ধ প্রয়োজনবশে স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ভোগের জন্য ভোগ, সুখের জন্য সুখ, মৈথুনের জন্য মৈথুন প্রার্থনা তাঁহারা করিবেন না। ইহাই আদর্শ মানব-মানবীর বিবাহিত জীবন।

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে

(খ) ইন্দ্রিয়-দমনকে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য জগতের প্রত্যেককেই বিবাহিত জীবন গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিবাহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সংযম সম্ভব নহে, এমন ভাবিবার কোনও কারণ নাই। অতীত এবং বর্ত্তমান কালে অসংখ্য মানব ও মানবী বিবাহ না করিয়াও যে ইন্দ্রিয়-সংযমে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব পৃথিবীর কোনও দেশেই নাই। কিন্তু বিবাহিত জীবনকে স্বীকার না করার ফলে লক্ষ লক্ষ মানব-মানবী যে সংযমভ্রষ্ট হইয়াছে ও জীবনকে কালিমায় কলঙ্কিত করিয়াছে, ইহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেখানে মানুষ ঝঞ্ঝাটের ভয়েই বিবাহ বর্জ্জন করিয়াছে, সেখানে জীব-সুলভ সুখলিপ্সা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া তাহাকে দিয়া সংযম-বিরোধী অনুষ্ঠান করাইয়া লইয়াছে এবং মানুষকে দিনের পর দিন নূতন সংসর্গের মাদকতায় শুধু আচ্ছন্নই করিয়াছে। এই সকল নরনারী একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমা বুঝিতে পারে নাই, অতৃপ্ত ভ্রমরের মত নিত্য নূতন ফুলের সন্ধান করিয়াছে। ফলে নিজের জীবনে যেমন অসংযমের অকথনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে,

ইন্দ্রিয়-দমনই কি বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য?

তেমনি আবার সমাজ-শরীরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসংযমের ব্যাপ্নী বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে। এই সকল স্থলে বিবাহিত জীবন সংযম-সাধনে সহায় একথা নিঃসন্দেহ। কারণ, ভোগলুব্ধ লম্পট মন সুখের আশায় যতই আকাশ-পাতাল ভ্রমণ করুক না কেন, বৈধ ভোগের সুযোগ পাইলে অবৈধ পথে সহজে পদার্পণ করিতে চাহে না।

কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই যে নরনারী সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে। বিবাহের দ্বারা নরনারীর মধ্যে দৈহিক এক-পরায়ণতা স্থাপিত হইলেও অযথা ভোগ নিবারিত হয় না। তাহা নিবারণের জন্য নরনারীর যথেষ্ট তপস্যার প্রয়োজন আছে। বিবাহ-প্রথা ভোগলোলুপ নরনারীর কামাচারকে বহুজনসংস্পর্শ হইতেই মুক্ত করিতে পারিল কিন্তু কামাচারকে প্রেমে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা এই প্রথাটার মধ্যে নাই, তাহা আছে তপস্যাতে। কামাচারকে একনিষ্ঠ করিবার জন্য বিবাহ-প্রথার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু এই একনিষ্ঠ কামাচারকে প্রেমে পরিণত করিয়া ভোগলুব্ধতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার সামর্থ্য বিবাহের নাই। পরন্তু তপস্যার সেই সামর্থ্য আছে। সুতরাং যদি কোনও মানব বা মানবী ইন্দ্রিয়-দমনের উদ্দেশ্য লইয়া বিবাহিত জীবন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বিবাহের মন্ত্রপড়া বা বিবাহের রেজেষ্টারী খাতায় নাম তোলাকেই শেষ কথা মনে না করিয়া তাহা-দিগকে বিবাহিত জীবনে পরস্পরের সহায়তায় সাধন-ভজন, নিয়ম-নিষ্ঠা, আচার-বিচার প্রভৃতিতে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে। বিবাহ করিলেই সংযম লাভ হয় না, বিবাহিত জীবনে সাধন-ভজন করিলেই সংযম লাভ হয়।

বিবাহ ও দম্পতীর দৈহিক একপরায়ণতা

বিবাহিত জীবনেও সংযম-লাভ তপঃসাপেক্ষ

(গ) সন্তান-জনন বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে

পারে বটে, কিন্তু ইহাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিলে, মানুষ নিজের মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কতক পরিমাণে ইতর জন্তুসমূহের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। যে সকল প্রাণী ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ব্যাপারটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, অথচ প্রকৃতির অন্ধ প্রেরণায় দিবসের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে কামোন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের যে কামক্রিয়া, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণিগণের বংশরক্ষারই জন্য বিধাতার অব্যর্থ বিধান। নির্দ্দিষ্ট কাল অপগত হইলে ইহাদের কামাতুরতাও অপগত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ প্রাণিগণের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাবের অবসান ঘটে। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগণের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও সন্তানজননে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পুরুষ প্রাণীরা গর্ভাধানের অব্যবহিত পরে এবং স্ত্রী-প্রাণীরা প্রসবান্তে জীবলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু মানুষের কামের সহিত তাহার ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ যোগ রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ সমগ্র জীবন কামোন্মত্ত থাকিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে সে আমরণ কামদমন করিয়াও চলিতে পারে। দিবসের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়, বৎসরের কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋতু অথবা জীবনের কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়স তাহার কাম-পরিতৃপ্তির জন্য অবধারিত নাই। যৌবনে কামের চাঞ্চল্য অপরাপর প্রাণিগণেরই ন্যায় প্রত্যেকটী মানুষের মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু এই ভরাবর্ষার উচ্ছৃঙ্খল প্লাবনকেও মানুষ চেষ্টার মত চেষ্টা করিলেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। অপরাপর প্রাণীদের মধ্যে কাম একটা দুর্নিবার অন্ধ তাড়না বলিয়াই সন্তানজনন তাহার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু মানুষ কামকে নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত করিবার পৃথক অধিকার পাইয়া সন্তানজনন ব্যতীত

সন্তান-জনন কি বিবাহের উদ্দেশ্য?

মানুষের কামে ও ইতর প্রাণীর কামে পার্থক্য

কামকে অপর পরিণতিতেও পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "শৃঙ্গার সাধনের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর সাধক কামচর্চ্চাকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সন্তানজনন এই উভয় উদ্দেশ্যের একটীরও উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া পরমানন্দ লাভের সোপান স্বরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা এই বাংলা দেশেই পাইয়াছিলেন। শৃঙ্গার সাধকদের সেই কামচর্চ্চার মাধ্যমিকতায় প্রেমানন্দ লাভের চেষ্টা লক্ষ লক্ষ স্থলে ব্যর্থতার কণ্টক-মালা আহরণ করিলেও কদাচিৎ দুই একটি অতি বিরল ক্ষেত্রে সাফল্যযুক্ত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। আবার কামচর্চ্চাকে এমন কি ইন্দ্রিয়সুখেরও উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া শুধু একটা লোকাচার, দেশাচার, স্ত্রী-আচার বা 'ফ্যাসানের' অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতেও মনুষ্যজাতি সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মোট কথা, কামচর্চ্চাকে মনুষ্যজাতি পশু-পক্ষ্যাদির অপেক্ষা অনেক প্রকার পৃথক্ প্রয়োজনে, পৃথক্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছে এবং করিতেছে, সন্তানজননের প্রাকৃত প্রয়োজন ব্যতীত অপরাপর প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে যাইয়া কামচর্চ্চাকে সংস্কৃত অথবা বিকৃত করিয়াছে এবং করিতেছে।

শৃঙ্গার সাধন

পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে যে মানব নিজ বুদ্ধি ও চিন্তা-চেষ্টাকে সর্ব্বপ্রকারে ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত করিবার অধিকার পাইয়াছে, তাহার পক্ষে পশু ও পক্ষীদের ন্যায় অন্ধ তাড়নায় সন্তান-জনন করিয়া যাওয়াকেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। সন্তানজনন বিবাহের উদ্দেশ্য রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ও যেমন-তেমন সন্তানের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। চাই সুসন্তানের জনন। যে পুত্র বলবান্, বীর্য্যবান্, চরিত্রবান্, সৎসাহসী, পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী এবং যে কন্যা বলবতী, বীর্য্যবতী, চরিত্রবতী, সৎসাহসিকা ও পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী, তাহারাই—সুসন্তান।

চাই সুসন্তানের জনন

যে পুত্রকন্যা ধর্ম্মানুরাগী, অধ্যবসায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সহিষ্ণুস্বভাব ও মরণ-ভয়রহিত,—তাহারাই সুসন্তান। যে পুত্রকন্যা জীবনের গৌরব দিয়া পূর্ব্বপুরুষদের কলঙ্ক-কালিমা ঢাকিয়া দেয় এবং পরপুরুষদের মধ্যে মঙ্গলের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে, তাহারাই সুসন্তান। যাহারা স্বার্থকে চাহিয়া বলবীর্য্যের অভাবে তাহাকে চাহিবার মত চাহিতে পারে না, আর, মেধা-মনীষার অভাবে তাহাকে বুঝিবার মত বুঝিতে জানে না, তাহারা সুসন্তান নহে। যাহারা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াও বলবীর্য্যের অভাবে সেই উৎসর্গকে বহুদেশব্যাপী এবং প্রজ্ঞার অভাবে বহুপুরুষ-ব্যাপী করিতে পারে না, তাহারাও সুসন্তান নহে। যাহারা সহস্র বিপদেও হৃদয়ে সাহস রাখিতে পারে, মৃত্যু-মুহূর্ত্তেও বাহুতে ভীমবলের

সুসন্তান কাহাকে বলে?

সন্ধান পায়, বজ্রপতনের মধ্যেও বুদ্ধিকে স্থির এবং লক্ষ্যকে অটল রাখিতে পারে, যাহারা নিজ হাতে মাথা কাটিয়া দিতে পারে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিতে পারে, হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে, দ্বিধাহীন চিত্তে সজীব সমাধিকে আলিঙ্গন করিতে পারে,—তাহারাই সুসন্তান। যাহাদের কাছে জীবন কর্ম্ম-সংগ্রাম, মরণ নবসংগ্রামের জন্য ক্ষণিক বিশ্রাম, যাহাদের জন্ম সার্থক মৃত্যুর জন্য এবং মৃত্যু শ্রেষ্ঠতর জন্ম গ্রহণের জন্য, যাহাদের ব্রাহ্মণত্ব শূদ্রকে নীচ হইতে উচ্চে তুলিয়া আনিবার জন্য, শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণকে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিঃশব্দে মরার মত পড়িয়া না থাকিতে দিবার জন্য,—তাহারাই সুসন্তান। যাহাদের স্ত্রীত্ব পুরুষের বন্ধন-মুক্তির জন্য, পুরুষত্ব নারীর দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য, যাহাদের স্বাধীনতা জগদ্ব্যাপী পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য, পরাধীনতা স্বাধীনতা লাভের শ্রেষ্ঠতম, আদর্শতম পন্থা আবিষ্কারের জন্য,—তাহারাই সুসন্তান। আর, যাহারা ইহা নহে, তাহারা কু-সন্তান।

কু-সন্তানের উৎপাদন কিছুতেই দাম্পত্য-বন্ধনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, বিশ্বব্যাপিনী কামতৃষ্ণাকে ইচ্ছাবলে গুটাইয়া আনিয়া একটী স্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়া তৎপর সাধনাসম্ভূত অব্যর্থ ইচ্ছারই বলে এই কামকে হস্তধৃত যন্ত্রের ন্যায় সুসন্তান-প্রজননে প্রয়োগ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। কাম যখন চরিতার্থতার বহু পথ পরিত্যাগ করিয়া একটী মাত্র পথকে অবলম্বন করে, তখন উহা মাত্র সমাজপত্তনই করে। কিন্তু **কাম যখন অন্ধ চরিতার্থতা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুষ্মানের ন্যায় নিজের কল্যাণকে, সন্তানের কল্যাণকে এবং জগতের কল্যাণকে দেখিয়া লয়, তখন উহা আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করে।**

বিবাহের উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজ সৃষ্টি

বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই আদর্শ সমাজের সৃষ্টি, যে সমাজে পিতামাতার হৃদয়জোড়া সদিচ্ছাগুলি সন্তান-সন্ততির জীবনের গৌরবদীপ্ত কর্ম্মে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং যুগের পর যুগে অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানকে বৃহত্তর ও মহত্তর এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎকে বৃহত্তর ও মহত্তর করিয়া তোলে। সেই সমাজের সৃষ্টি কিছুতেই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে পারে না, যে সমাজে পুত্রকন্যা পিতামাতার স্কন্ধে গুরুভার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন। য়ুরোপের একশ্রেণীর সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ (sociologists) সন্তান-সন্ততিরূপ বিরাট আবর্জ্জনাকে পারিবারিক জীবন হইতে অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ

পাশ্চাত্য জগতে বিবাহ-সম্পর্কিত নানা আন্দোলনে

কৃত্রিম উপায়ে নারীর সন্তান-সম্ভাবনাকে নাশ করিবার জন্য নিত্য নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া পৈশাচিক আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, কেহবা প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা এমন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন

আনয়ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, যাহাতে পিতা গর্ভাধান করিয়া এবং মাতা প্রসব করিয়াই সন্তান-সম্বন্ধীয় সকল দায়িত্ব হইতে 'খালাস' পাইতে পারেন এবং রাষ্ট্র (state) নবজাত পুত্রকন্যার ভরণ, পোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বলাই বাহুল্য যে, এই বিষয়ে য়ুরোপ ভুল পথে চলিয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কিত যে-সকল আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে, তাহাতে পাশ্চাত্য পুত্রকন্যাগণ নিজ নিজ পরমারাধ্যা জননীকে আধ্যাত্মিক আদর্শ-বাদীর শ্রদ্ধাপূত বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে না দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বভাব বৈজ্ঞানিকের বস্তুতন্ত্র প্রশ্ন-পরায়ণ দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিবে এবং সম্ভবতঃ করিতেছেও। **যাহারা জননীর রমণীমূর্ত্তি চিন্তা করে বা করিবে, তাহাদের আর সর্ব্বনাশের বাকী কোথায়?** এখনও পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যেরা বিবাহের যথার্থ আদর্শের সন্ধান পায় নাই বলিয়া কামের পঙ্কিল আবর্ত্তেই ডুবিয়া মরিবার আয়োজন করিতেছে। য়ুরোপ ও তৎশিষ্যগণের মানসিক জগতে এখনও দেহসুখের পূর্ণ রাজত্ব চলিয়াছে বলিয়াই সন্তান-সন্ততি স্বামি-পত্নীর সুখের বিঘ্ন, তাই বর্জ্জনীয়। রক্ত-মাংসের ক্ষুধা য়ুরোপীয়দের অস্থি-মজ্জা চর্ব্বণ করিয়া খাইতেছে বলিয়াই, আজও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নীতিবাদী (moralist) বা আধ্যাত্মবাদীরা (idealists) বিবাহ-সম্বন্ধে সুপ্রজননের অতিরিক্ত বড় কোনও কথা কহিতে পারেন নাই। বলিতে গেলে সমগ্র পৃথিবীরই যাহারা সম্রাট, সেই য়ুরোপীয়দিগেরও একটু নিন্দা করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এইটুকু রসনা-কণ্ডূয়নহেতু নহে।

বিবাহ ও সুপ্রজনন

ভারতবাসী পাশ্চাত্যদের অপেক্ষাও বড় কথা বিবাহ সম্বন্ধে কি ভাবিতে পারিয়াছেন, তাহার ভূমিকা বা back-ground রূপে এইটুকু উল্লেখ করিতে হইল। কারণ, বিবাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইল ভগবৎ-সাধনা বা

আত্মার উদ্ধার। সুসন্তান-প্রজনন ইহার তুলনায় অনেক ছোট কথা। তথাপি, এই সুসন্তান জনন করিতে হইলেও বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। সন্তান পিতামাতার দেহ পায়, মনও পায়। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যাঁহারা দেহ ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিও প্রকৃতিবশে বিশুদ্ধ দেহ ও বিশুদ্ধ মনের অধিকারী হইবে। সংযম-সাধনার দ্বারা যাঁহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুপুষ্ট, সুদৃঢ় এবং মনোবৃত্তিসমূহকে অনাবিল ও সুসমর্থ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিও সবল দেহ ও সমর্থ মনেরই অধিকারী হইবে। পিতামাতার পূর্ব্বগামী পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন জীবনের বহু অকল্যাণ হয়ত ব্রহ্মচারী পিতা ও ব্রহ্মচারিণী মাতার সম্যক্ সুবিশুদ্ধতা স্বত্বেও সন্তানের দেহ ও মনের মন্দিরে উঁকি দিতে চাহিবে, কিন্তু পিতামাতার তপঃসাধনাই সন্তানকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বহুল পরিমাণে দান করিবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান-সংখ্যা কমাইতে গেলে মহাবীর্য্যশালী তপস্বী সন্তানের জন্মলাভ অসম্ভব। কারণ, বৈজ্ঞানিকেরা নারী এবং পুরুষের সম্মিলিত সত্ত্বাশক্তিকে (রজোবীর্য্যকে) সন্তানরূপে পরিণত হইতে না দিয়া নারীকে প্রসবের যন্ত্রণা এবং পুরুষকে সন্তান পালনের অর্থব্যয় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন, কিন্তু বৃথা-মৈথুনে উভয়ের যে দৈহিক শক্তির ক্ষয় হইল এবং যে মানসিক পবিত্রতার ভ্রষ্টতা জন্মিল, কোন প্রকারেই তাহার ক্ষতি-পূরণ করিতে পারেন না। পিতামাতার দেহমধ্যস্থ যে মহাবস্তুদ্বয়ের সাম্মিলনে সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ দেহ জন্মে এবং পিতামাতার মনোমধ্যস্থ যে প্রবল বৈদ্যুতিক প্রেরণাসমূহের সম্মিলনে সন্তানের জন্য সর্ব্ববিষয়ের ধারণক্ষম শক্তিমান মন গঠিত হয়, তাহাদের অপচয়কে স্তম্ভিত করিবার

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্মনিরোধ-চেষ্টা তপস্বী সন্তান লাভের সহায়ক নহে।

ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকের পিতামহেরও নাই। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারাই এই অপচয়কে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং সুপুষ্ট দেহ, সুসংযত মন ও কল্যাণময়ী প্রেরণা দিনের পর দিন সঞ্চয় করিয়া উপযুক্ত কালে ইহাকে সন্তানার্থে প্রয়োগ করিতে হইবে। সন্তানজনন যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আদর্শ সমাজে সন্তানজনন এইরূপই হইবে।

(ঘ) জীবনসংগ্রামের দুঃখকষ্টের লঘুতা-সাধনও বিবাহের একটী উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু মানুষের পরিশ্রম কমাইবার যে দুইটী উপায় আছে, একমাত্র সদ্‌গৃহীর পক্ষেই সেই দুইটী সহজলভ্য, কপট গৃহীর নহে। দুঃখকষ্টের লঘুতাসাধনের প্রথম উপায়—শ্রমবিভাগ, দ্বিতীয় উপায়—কষ্টে উপেক্ষা। সাংসারিক কর্ম্মের অর্দ্ধাংশ যখন গৃহিণী নিজ স্কন্ধ পাতিয়া গ্রহণ করেন, তখন গৃহস্থের কিছু বিশ্রামের অবসর ঘটে। আবার, অত্যন্ত-পরিশ্রমসাধ্য উপার্জ্জনাদি কার্য্য গৃহস্থের স্কন্ধেই ন্যস্ত থাকিলে গৃহিণী বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার আক্রমণ অনায়াসেই এড়াইয়া চলেন। গৃহস্থকে যদি সংসারের সকল কাজ করিতে হইত, অথবা গৃহিণীকে যদি নিজের উদর নিজে চালাইতে হইত, তবে আর কাহারও নিঃশ্বাসটুকু ফেলিবার অবসর মিলিত না। য়ুরোপে পতি-পত্নী উভয়কেই উদরান্ন অর্জ্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। ফলে, হোটেলের অন্ন খাইয়াও শ্রমক্লান্ত স্বামিপত্নী পরস্পরকে বিশ্রাম ও অবসর দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। এই ভারতেও যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিকে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন করিয়া লইবার জন্য রাস্তায় বাহির হইতে না হইবে, ততদিন পর্য্যন্তই স্বামিপত্নীর মধ্যে সংসারের শ্রমবিভাগ বিদ্যমান থাকিবে এবং একে অন্যের জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন।

বিবাহ ও জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-হ্রাস

জীবন-সংগ্রামের মৃদুতা সাধনের পক্ষে দ্বিতীয় উপায়টী সম্যক্ মানসিক। বিপদকে যে গ্রাহ্য করে না, তাহাকে বিপন্ন করিবে কে? মৃত্যুকে যে গ্রাহ্যে আনে না, কে তাহাকে মারিতে পারে? শ্রমে যাহার অরুচি নাই, কর্ম্মের কঠোরতা তাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে না। বিপদের পশ্চাতে যিনি সম্পদের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, মৃত্যুর পশ্চাৎ হইতে যিনি অমৃতত্বের আহ্বান শুনিতেছেন, বিপদ ও মৃত্যু তিনি ত' তুচ্ছ করিবেনই! সদ্‌গৃহী ও সদ্‌গৃহিণীর মধ্যেও পরস্পরের যে বিশুদ্ধ প্রেম বর্ত্তমান থাকে, তাহারই শক্তিতে তাঁহারা সকল দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। প্রাণান্ত শ্রমে ক্লান্ত হইয়াও যখন গৃহী তাহার প্রেমপ্রতিমা সহধর্ম্মিণীর হাস্যমধুর মুখখানির কথা মনে করে, দুর্ব্বল হৃদয়ে সে নববল পায়। রোগশীর্ণ, দুঃখজীর্ণ, অবশ দেহে শ্রম করিতে করিতে কাতর হইয়াও গৃহিণী যখন তাহার প্রাণদেবতা হৃদয়স্বামীর জীবন-জুড়ান সস্নেহ দৃষ্টিটুকুর কথা ভাবে, সে যেন নবজীবন লাভ করে। প্রেম দুঃখকে জয় করিবার ক্ষমতা দেয়, প্রেম অগ্নির দাহিকা শক্তিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, প্রেম তুষারের শীতলতাকে বাষ্পীভূত করে। যেখানে স্বামিপত্নীর পরস্পরের মধ্যে সহৃদয় সহযোগিতা নাই এবং যেখানে নিবিড় প্রেম নাই, সেখানে জীবন-সংগ্রাম মৃদুতা লাভ করে না,—দুঃখের পর দুঃখ শুধু বাড়িয়াই চলে। স্বামিপত্নীর মধ্যে প্রকৃত মমত্ববোধ থাকা চাই, একে অন্যকে যথার্থ আপন বলিয়া জানা চাই। নতুবা, হয় শৃঙ্খলিতা নারী পুরুষের অবিবেকী অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হইয়া জীবনকে দুঃসহ ও দুর্ব্বহ বোধ করিবে অথবা কটুকাটব্য-পীড়িত তর্জ্জনক্লিষ্ট স্বামী বিবাহকে অভিসম্পাত বলিয়া মনে করিবে। স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে প্রকৃত সমবেদনার

কষ্টে উপেক্ষা

দুঃখের লঘুতা সাধনে প্রেমের শক্তি

অভাব বলিয়াই আজ একদিকে যেমন শত শত নির্য্যাতিতা নারীর অশ্রুধারায় ভারতের গৃহতল সিক্ত হইতেছে, আর এক দিকে তেমনই মর্ম্মাহত ব্যথিত পুরুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় ভারতের আকাশ প্রতপ্ত হইতেছে। উভয়ের মধ্যে শ্রমবিভাগের যথার্থ মর্য্যাদা ও সীমা নির্দ্দেশ করিতে আজ সমাজ-সংস্কারকের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু একটুখানি সহানুভূতির, একটুখানি মমত্ব-বোধের। গৃহীর গৃহছাদের তল হইতে দুঃখকষ্টকে নির্ব্বাসিত করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, কোনও যোগীর নাই, দণ্ডীর নাই, সাধুর নাই বা নেতার নাই,—আছে শুধু একমাত্র সহানুভূতির। পুরুষ যখন নিজের স্বার্থের কথা কম করিয়া ভাবিয়া নারীর স্বার্থের কথা বেশী করিয়া ভাবিবে, আবার নারী যখন নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কম করিয়া হিসাবে আনিয়া পুরুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই বেশী চিন্তা করিবে, সেই দিনই গৃহিজীবন তাহার দুঃখ-দুর্গতির স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা দূরে অপসারিত করিয়া শান্তির সুবিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

প্রেম চাই, নতুবা উদ্ধার নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার ক্ষুধা কমাইয়া জীবনসংগ্রামের আক্রমণকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছেন, কৌমার্য্যের একাগ্রতার মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিয়া কঠোর কষ্টকে অগ্রাহ্য করিবার সামর্থ্য পাইয়াছেন। গৃহীকে ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে কমাইয়া দিলে চলিবে না, ভগবানকে ভালবাসিতে গিয়া স্বামীর পক্ষে পত্নীবর্জ্জন এবং পত্নীর পক্ষে স্বামিবর্জ্জন করিলেও হইবে না। সকল ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়াই, সকল আকুতি-কাকুতি লইয়াই, সকল প্রবৃত্তির কোলাহলের মধ্যেই তাহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, স্ত্রীকে লইয়াই স্বামীকে এবং স্বামীকে লইয়াই স্ত্রীকে ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। তাহাদের আজ সহানুভূতি চাই, তাহাদের আজ প্রেম চাই।

কিন্তু পত্নীর পক্ষ লইয়া বিধবা মাতা, ভগ্নী বা ভ্রাতৃজায়ার অপমান করিবার নাম দাম্পত্য মমত্ববোধ নহে, পত্নীর অসুস্থতার অজুহাতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রদের বা অন্যান্য অনুজীবীদের উপরে অমানুষ অত্যাচার করার নাম দাম্পত্য সহানুভূতি নহে, পত্নীর ভরণপোষণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপলক্ষে সহোদর ভ্রাতাকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন করার নাম পত্নী-প্রেম নহে। আবার, স্বামীর স্বার্থ-সংরক্ষণের নাম করিয়া নারীজনোচিত স্বাভাবিক কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির সমক্ষে সম্মার্জ্জনীহস্তে রণ-চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ করার নামও স্বামি-প্রেম নহে। যথার্থ প্রেম সাধন-সাগরের মন্থনোত্থ অপূর্ব্ব অমৃত। স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে এই প্রেমামৃতের সঞ্চারের জন্য সর্ব্বপ্রকার অযথা মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একভাবানুগ একপন্থানুগ ভগবৎ-সাধনের আবশ্যক। যেদিন এই অনাবিল সুবিশুদ্ধ সুপবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে, সেই দিনই একে অন্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইবে এবং এই-ভাবেই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। হে ভারতের আত্মবিস্মৃত যুবকযুবতীগণ! তোমরা আজ স্থির চিত্তে এই কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা কর। বহু-সন্তান-পরিবৃত হইয়া তোমরা যে দিনের পর দিন জীবনকে মরুভূমি করিয়া তুলিতেছ, অপ্রকৃত সুখ-সৌভাগ্যের পশ্চাতে মরীচিকালুব্ধ মৃগের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে যে প্রকৃত সুখসৌভাগ্যে চিরবঞ্চিত রহিয়া যাইতেছ, সেই নিদারুণ অধঃপতনের গতিবেগ লক্ষ্য করিয়া আজ সাবধান হও, অযথা মৈথুন সঙ্কল্পপূর্ব্বক পরিহার করিয়া বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত কর, আপ্রাণ

অপ্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের লক্ষণ

প্রকৃত প্রেম লাভের পথ অযথা মৈথুন ত্যাগ ও ভগবৎ-সাধন

প্রয়াসে নিজেরা যথার্থ মনুষ্যত্বের গরীয়ান্ গৌরবে দীপ্যমান হও এবং শত শত দাম্পত্য পবিত্রতার অমর্য্যাদাকারী অসংযত অমানুষকে তোমাদের আদর্শ জীবনের অপরাজেয় প্রভাবে সুষ্ঠু রূপে গড়িয়া তুলিতে যত্নবান্ হও। নিশ্চিত জানিও, যত বুদ্ধিমানেরই আবিষ্কার হউক না কেন, কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা কখনই জীবন-সংগ্রামের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দূরীভূত করা যাইবে না, বিজ্ঞানের বলে চখের জল ও বুকের ব্যথার প্রশমন হইবে না।

ভগবৎ-সাধনাই বিবাহের উদ্দেশ্য

(ঙ) ভগবৎসাধনাকেই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় একমাত্র তান্ত্রিক যোগাচার্য্যেরা ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তেমন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন নাই। সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতারাই বিবাহকে একটা পরমপবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিবাহিত জীবনের গোপনতম অংশটুকুকেও ভগবৎসাধনা বলিয়া অকুতোভয়ে প্রচার করিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র

বিবাহ ও তন্ত্রশাস্ত্র

ব্যতীত আর কেহ তেমন সাহসী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতে যখন তন্ত্রধর্ম্মের উন্মেষ হইল, তখনই স্বামিপত্নীর মৈথুনকে পূজা, অর্চ্চনা-ও ভোগারতির ন্যায় সম্মানপূর্ণ স্থান দান করা হইল। ইহার পূর্ব্বে প্রাগ্‌বৈদিক্ যুগে বিবাহ প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক মিলন, বৈদিক যুগে প্রধানতঃ সন্তানোদ্দেশ্যযুক্ত মিলন এবং প্রায় সকল যুগেই অল্প-বিস্তর শ্রমবিভাগমূলক মিলন ছিল। কিন্তু তান্ত্রিকের পক্ষে ইহা হইল একটী অভিনব সামগ্রী।

তান্ত্রিক সাধক বলিলেন—

"ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও আমার উদ্দেশ্য নয়, সন্তান-জননও আমার উদ্দেশ্য নয়, শ্রমবিভাগও আমার উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু, আমার উদ্দেশ্য নিজের অভাবকে পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া, নিজের অসম্পূর্ণতাকে অপর কাহারও সম্পূর্ণতা দিয়া দূর করিয়া দেওয়া। যিনি আমার এই পরিপূর্ণতা সাধন করেন, তাঁহাকে আমি স্ত্রী বলি না, তাঁহাকে আমি বলিতে চাহি আমার শক্তি। যত প্রকারে তাঁহার সহিত আমার সহযোগ সম্ভব, প্রত্যেকটী প্রকারের মধ্য দিয়াই আমি ভগবৎ-সাধনাই করিয়া থাকি, ইহাতে ইন্দ্রিয়সুখ হইল কি না, সন্তানোৎপত্তি ঘটিল কি না প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় ভাবিবার আমার অবসর কোথায়?"

তান্ত্রিক সাধিকা বলিলেন—

"তোমরা যাহাকে বিবাহ বল, তাহাকে আমরা বিবাহ বলিয়া মানি না; আমরা জানি, ইহা নিত্যপুরুষের সহিত নিত্যা প্রকৃতির মিলনাভিসার। আমি যখন আমার স্বামীকে আমার মন ও আত্মা দিবার সময়ে ভগবানেরই স্পর্শ পাই, তখন দেহদানের সময়েও কেন না ভগবানের স্পর্শ পাইব? যদিও আমার দেহ প্রাকৃত পদার্থ, তথাপি, এই দৈহিক মিলনের পশ্চাতে অপ্রাকৃত নিত্য লীলা চলিতেছে এবং

ভগবৎ-সাধনারই জন্য দেহকে সর্ব্বথা নিয়োজিত করিয়া আমরা প্রাকৃত দেহকেও অপ্রাকৃত গৌরবের আস্পদ করিয়াছি। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বা সন্তানজননের জন্য মৈথুন পশুপক্ষীতেও করে, পরন্তু আমাদের মৈথুন সর্ব্ববিধ লৌকিক উদ্দেশ্য-বিরহিত, আমাদের ইন্দ্রিয়-পরিচালনা অতীন্দ্রিয় সত্তারই অনুভূতির জন্য।"

তন্ত্র ধর্ম্মের শুভময়ী প্রেরণা

যদিও তান্ত্রিকের আচার অতিশয় বীভৎসতা-সঙ্কুল হওয়ায় তন্ত্রধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লোপ পাইয়াছে, তথাপি তান্ত্রিক সাধকেরা মৈথুনের এই যে কৌলিন্য দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎ মানবগণের মধ্যে শুভ-সাধনার প্রেরণা জাগ্রত করিতে ভুলিবে না। এমন এক অভাবনীয় মহাযুগের অরুণোদয় এই জগতে শীঘ্রই হইতেছে, যখন সকল ধর্ম্মের সকল বিরোধ সামঞ্জস্যীভূত, হইয়া মানুষ মাত্রকেই পরমধর্ম্ম মানব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে এবং বৌদ্ধাচারী ও তন্ত্রাচারী বেদ-বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ করিবে, কোরাণ-ধর্ম্মী বাইবেল-বিদ্বেষে বিরত হইবে, জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের বৈষম্য নিরাকৃত হইবে। এক মহাসমন্বয়ের যুগ যেন বিষ্ণুবাহন গরুড়ের দুইপক্ষ স্বরূপ নারী ও পুরুষে ভর করিয়া বাত্যাবিক্রমে ছুটিয়া আসিতেছে এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা দেখিতে পাইয়াই যেন তান্ত্রিক সাধকেরা বলিয়া ছিলেন,—"মৈথুন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিও নহে, অধর্ম্মও নহে, ইহা ধর্ম্মেরই অঙ্গ, ধর্ম্মেরই সাধন।" যে অতীতের গর্ভে বৈদিক যুগ সমাহিত হইয়াছে, তান্ত্রিক যুগও তাহারই উদার উদরে ডুবিতে বসিয়াছে, কারণ, এ জগতে

আচারের নিত্যত্ব নাই, সত্যই নিত্য। বৈদিকের আচার গিয়াছে, বৌদ্ধের আচার গিয়াছে, সত্য রহিয়াছে। তন্ত্রেরও আচার গিয়াছে, এখন সত্যটুকু রহিয়াছে। নিজস্বতাকে প্রসারিত করিবার জন্য তন্ত্রের তত্ত্ব ও আচার বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল এবং তান্ত্রিক কুলাচার, বীরাচার, বামাচার প্রভৃতিই কিশোরী-ভজন, কর্ত্তা-ভজা, বাউল প্রভৃতি নানা নাম ধরিয়া রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রতিষ্ঠার যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং যে পরম সত্য প্রত্যেকটী নবোদিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবর্ত্তন ও আলোড়নের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, তাহাই আজ সকল বৈপরীত্য ও আপাতদৃষ্ট বিরুদ্ধতার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া সর্ব্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া যেন নবতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। এবং এই বিগ্রহের অস্থি-সংযোজন-কালে যেন কাহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ জগতের সকল কোলাহলকে স্তম্ভিত করিয়া বলিতেছে,—

আচার নিত্য নহে, সত্যই নিত্য

তান্ত্রিক তন্ত্রের বহুপ্রসারিণী গতি

বিবাহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্ব্ব-সমন্বয়ী শ্রেষ্ঠ মত

"বিবাহের উদ্দেশ্য ভগবৎ-সাধনা, নর-নারীর মিলনের মূলে ভগবৎ-সাধনা, সন্তানোৎপাদন ভগবান্‌কে পাইবার জন্য, সন্তান-পালন ভগবানকে বুকে ধরিবার জন্য। ভগবান আজ মনুষ্য-জীবনের কদর্য্যতম প্রবৃত্তির মূলেও নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, মৈথুনরত নরনারীর কামের পূতি-গন্ধের মধ্য দিয়াও স্বকীয় অঙ্গের প্রাণমনোহারী

সুমধুর পদ্মগন্ধ ছড়াইতে চাহিতেছেন। নবজাগ্রত যুগের ভারতসন্তান ইহা বিস্মৃত হইও না।”

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য প্রত্যেককেই যে বিবাহিত হইতে হইবে, এমন নহে। চিরকুমার ও চিরকুমারী যে কেহ থাকিবেন না, এমন নহে। নিজ শক্তি, সামর্থ্য, রুচি, প্রকৃতি, সংস্কার ও প্রবৃত্তির বেগাবেগ বুঝিয়া, বলাবল বুঝিয়া আত্মার উদ্ধারে এবং জগতের উদ্ধারে এক দল মহামানব ও মহা-মানবী চিরকালই জগতে সন্ন্যাসের গরীয়ান্ গৈরিক পতাকা উড্ডীন করিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন, সন্দেহ নাই। মানুষমাত্রেরই পক্ষে বিবাহ যে বিধি-নির্দিষ্ট অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধি এবং বিবাহিত না হইলেই যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধতা করা হয়, এইরূপ মিথ্যা যুক্তিজাল পদনখাঘাতে ছিন্ন করিয়া একদল তেজস্বী, বীর্য্যবান্, মনঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং নারী চিরকালই তাঁহাদের তপস্তেজোদীপ্ত মহিমান্বিত জীবন সন্ন্যাসরূপ জগৎকল্যাণ আদর্শের চরণে সমর্পণ করিয়া বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দনে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিবেন। কিন্তু ভগবান্ আজ শুধু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ের কামলেশ-বর্জ্জিত জ্ঞানশুভ্র অজিনাসন অধিকার করিতে পারিয়াই তুষ্ট নহেন ; যাহার হৃদয় নিয়ত বিক্ষোভে চঞ্চল, নিয়ত আসক্তিতে মলিন, সেই সংসারসেবীর হৃদয়টীকেও নিজ হাতে জঞ্জালমুক্ত করিয়া, চরণস্পর্শে বিক্ষোভহীন করিয়া দয়াল ঠাকুর সেখানে বসিতে চাহেন। প্রেমের ঠাকুর আজ গার্হস্থে ও সন্ন্যাসে সমান সৌরভ পাইতে চান। তাই, আজ যাহারা বিবাহ করিবেন, তাহারা ভগবান্‌কে পাইবার জন্যই বিবাহ করিবেন, স্বামী উত্তর-

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যক্তিমাত্রেরই কি বিবাহ আবশ্যক?

ভগবান আজ গৃহীর জীবন-মধ্যেও ফুটিতে চাহেন

সাধিকা স্বরূপে পত্নীগ্রহণ করিবেন, পত্নী উত্তরসাধক স্বরূপে স্বামী গ্রহণ করিবেন এবং একে অন্যের সাহচর্য্যের মধ্যবর্ত্তিতায় পরস্পরের দেহে পরস্পরের মনে, পরস্পরের উৎকর্ষে এবং পরস্পরের প্রশান্তিতে শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন।

"উত্তর সাধক" ও "উত্তর সাধিকা" কথা দুইটী এস্থলে একটু প্রণিধানযোগ্য। জীবনের চরম চরিতার্থতাকে লাভ করা যখন স্বামীর পরমৈকলক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য-লাভ-কল্পে প্রাণপাত প্রয়াসে যখন তিনি যত্নপরায়ণ, তখন তাঁহাকে বলা চলে,—"সাধক"। স্বামী যে পরম লক্ষ্যকে আয়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, নিজ-সুখ-কামনায় অক্লেশে জলাঞ্জলি দিয়া, নিজের ব্যক্তিগত সাধ, আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তির দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের প্রার্থিত সকল কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ হইতে নিজেকে সম্যক্ বঞ্চিত করিয়া স্বামীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবার জন্য নিজেকে দুঃখ দিয়াও যখন স্ত্রী সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর ন্যায় জাগ্রত, উদ্যত ও প্রস্তুত, স্বামীকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাঁর চেষ্টার নাই অন্ত, যত্নের নাই ত্রুটী, অবসাদগ্রস্ত স্বামীর বাহুতে উৎসাহের বিদ্যুৎ-সঞ্চারণায় যাঁর কৃতিত্বের নাই তুলনা, নিয়ত মাভৈঃ বাণীতে যিনি স্বামীর সাধন-পথের সকল শঙ্কা, সকল ভয়, সকল আতঙ্ক, সকল আশঙ্কা, সকল সংশয়, সকল সন্দেহ হরণ করেন এবং ইহাই যিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে,—"উত্তর সাধিকা।" আবার মনুষ্য-জন্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা ভগবদ্দর্শনকে আয়ত্ত করিবার জন্য স্ত্রী যখন নিঃশেষে আত্মোৎসর্গশীলা,—তখন তাঁহাকে বলা চলে,—"সাধিকা।" স্বামী যখন নিজ সুখলালসায় শত পদাঘাত হানিয়া, আত্মসুখের সুযোগ হইতে স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত

উত্তর-সাধক ও উত্তর-সাধিকা

করিয়া অহোরাত্র সহধর্ম্মিণীকেই তাঁহার জীবনৈকলক্ষ্য সাধনের সহায়তা ও আনুকূল্য প্রদান করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে বলা চলে "উত্তর-সাধক।" আদর্শ দম্পতীর জীবন এই উত্তর-সাধক ও উত্তর-সাধিকারই জীবন।

বিবাহিতের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

সুখপিপাসা অতি মোটা কথা, সৌন্দর্য্য-পিপাসাই যেন মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে। সৌন্দর্য্য-পিপাসাই কাহাকেও যতিধর্ম্মে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাহাকেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে। চিরসুন্দরের মোহিনী মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী প্রাকৃত নারী ও প্রাকৃত পুরুষের রূপ হইতে দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গায়িত আবেগ ফিরাইয়া লইয়াছেন, আবার গৃহী বা গৃহিণী যে নারী বা পুরুষের মুখপানে আত্মহারা দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, তাহাও সেই পরমসুন্দরকে আঁখির তারায় বাঁধিয়া রাখিবারই দুর্দ্দমনীয় অজ্ঞাত তাড়নায়। চিরসুন্দরেরই চিরমধুর পরশ পাইবার জন্য সন্ন্যাসপন্থী নিবৃত্তিকে এবং গার্হস্থ্যপন্থী প্রবৃত্তিকে উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। একই পিপাসা, একই অতৃপ্তি উভয়কে অঙ্কুশতাড়নে নক্ষত্রবেগে

সুখপিপাসা বনাম সৌন্দর্য্যপিপাসা

ছুটাইয়া চলিয়াছে। শ্রীভগবান্ এই পিপাসার পরমা পরিতৃপ্তি। নিবৃত্তির

শ্রীভগবানই এই পিপাসার পরমা পরিতৃপ্তি

কণ্টকাস্তৃত পথেই চল, কিম্বা প্রবৃত্তির উদ্দামগতি রথেই চড়, ভগবানকে পাইলেই সকল শ্রম সার্থক, সকল কষ্ট সফল,—নতুবা একমাত্র অবসাদই তোমার ললাটের লিখন। চিরব্রহ্মচারী ভোগবিমুখ সন্ন্যাসী যদি ভগবানকে ভুলিয়া নিবৃত্তি-ধর্ম্মের অনুশীলন করেন,তবে তিনি গোলক-ধাঁধায়ই ঘুরিয়া মরিবেন। পুনশ্চ, ভগবানকেই একমাত্র ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল না জানিয়া গৃহী যদি প্রবৃত্তিধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তবে সুন্দরকে দেখিতে চাহিয়া তিনি শুধু কুৎসিতের প্রতিই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, সুন্দরের স্পর্শ পাইতে যাইয়া অসুন্দরকেই বুকে জড়াইয়া ধরিবেন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-প্রলেপ মাখিতে যাইয়া ক্রিমিকুলসেবিত পূতিগন্ধ পুরীষই মর্দ্দন করিবেন, সুন্দরের রসসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইয়া অসুন্দরের কামকূপেই ডুবিয়া মরিবেন। কিন্তু যেদিন ভগবানকেই সকল সৌন্দর্য্যপিপাসার পরমা তৃপ্তি বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ গৃহাশ্রমী বুঝিতে পারেন, সেই দিন নারীর সঙ্গ পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের সঙ্গ নারীর পক্ষে প্রবঞ্চনাসঙ্কুল ও মরীচিকাধর্ম্মী

বিবাহিতের সাধনা

হয় না। পরস্পরকে শ্রীভগবানেরই রূপবিগ্রহ, রস-বিগ্রহ, মাধুর্য্যবিগ্রহ জানিয়া যখন নরনারী দেহের, মনের ও আত্মার সম্মিলন সাধন করেন, তখন প্রেমের বন্যায় কাম ডুবিয়া যায়, ব্রহ্মানুভূতি ও ভূমানন্দে দেহানুভূতির চঞ্চলতা ও বিষয়-সুখের আবিলতা শতধা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, দেহক্ষয় করিয়াও সম্মিলিত নরনারী পরমাক্ষয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই অনুশীলন করেন। প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে শ্রীভগবান্ তখন উভয়েরই দেহমনে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান থাকিয়া মৈথুনরূপ পশুধর্ম্মকে জগৎকল্যাণকর দেবধর্ম্মে পরিণত করেন এবং নরনারীর প্রত্যেকটী অঙ্গসঞ্চালনের পশ্চাতে ভগবান্ নিজ সর্ব্বব্যাপী

অস্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশ-চেষ্টাকে মৈথুন-পরায়ণ দম্পতীর নিকটে নিয়ত অনুভূয়মান রাখিয়া তাহাদের প্রাকৃতজনোচিত কাম-চেষ্টাকেও অপার্থিব প্রেমসাধনায় রূপান্তরিত করেন। বলিতে গেলে, দেহ তখন নিদ্রিত, আত্মাই তখন জাগ্রত এবং আত্মার নির্বিষয় আনন্দের মধ্য দিয়াই দেহ নিজের অজ্ঞাতসারে সন্তানজনন ও সন্তানপ্রসব করিয়া যায়। এই ভাবে ভগবৎ-প্রেমের মধ্য দিয়া স্বামিপত্নীর দেহ জগতের চক্ষু জুড়াইবার জন্যই নিজেদের নিত্যসুন্দরের পিপাসাকে পুত্র ও কন্যারূপে বিগ্রহান্বিত করিয়া তোলে।—ইহাই বিবাহিতের সাধনা।

ভগবৎ-সাধনাই মূল লক্ষ্য, সন্তান-সন্ততি গৌণ প্রয়োজন মাত্র

ভগবৎ-সাধনাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে সন্তানসন্ততি না জন্মিলেই বা ক্ষতি কি? কত ভাগ্যবান্ দম্পতী যে দেবধর্ম্মের অনুশীলনে মগ্ন হইয়া আমরণ অপত্যোৎপাদনের কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন! আবার, কত কত সাধক-সাধিকা পুত্রকন্যার পিতামাতা হইয়াও দেহকে আত্মার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিতে অবসর দেন নাই। চিরসুন্দর ভগবানকে পাইবার জন্য যেটুকু বৈশিষ্ট্য সঞ্চয় আবশ্যক, তাহাই তাঁহারা দেহে-মনে সঞ্চয় করিতেছেন এবং চিত্রশিল্পী বা কবি যেমন চিরসুন্দরের পিপাসাকেই ফুটাইয়া তুলিবার আবেগে ও আবেশে চিত্র ও কবিতা লিখিয়া যান, তেমনি ভগবানকে অনুভব করিবার আবেগে ও আবেশে মৈথুনরত হইয়া দেহ ও মনের বিশিষ্টতাকে সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত করিয়া নিত্য নব সৌন্দর্য্য-বিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ভরা রসানুভূতি থাকিলেও রেখা এবং শব্দের উপরে নিজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে যেমন মহারসিক ব্যক্তিও চিত্রের বা কাব্যের মধ্য দিয়া নিজ হৃদয়কে প্রবাহিত করিতে পারেন না, ঠিক তেমনি দেহের এবং মনের প্রত্যেকটী স্পন্দনের উপরে আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত

হইবার পূর্ব্বে নরনারী তাহাদের সন্তানসন্ততির মুখশ্রীতে নিজ নিজ মুখশ্রী, সন্তানসন্ততির হৃদয়ে নিজ নিজ হৃদয় এবং সন্তান-সন্ততির অনুভূতিতে নিজ নিজ অনুভূতিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। অনেকের ভিতরেই চিত্রকর হইবার উপাদান থাকে কিন্তু বর্ষের পর বর্ষ প্রাণপণ যত্নে রেখার সাধনা না করিলে ভিতরের সুপ্ত প্রতিভা পূর্ণ জাগ্রত হয় না। অনেকের ভিতরেই কবি হইবার উপাদান থাকে, কিন্তু বর্ষের পর বর্ষ একনিষ্ঠ প্রযত্নে শব্দশক্তির সাধনা না করিলে কবিত্ব-শক্তির সম্যক্ বিকাশ ঘটে না। ঠিক তেমনি প্রায় প্রত্যেকেরই ভিতর সন্তান-জননের সামর্থ্য থাকে, কিন্তু বর্ষের পর বর্ষ অনলস ভাবে দেহ-মনের স্পন্দনের যথোচিত সাধনা না করিলে সুজন-সৃষ্টির প্রকৃত শক্তির উন্মেষ ঘটে না। অপরিসীম অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠা সহকারে সরল রেখা, বক্ররেখা, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বহুভূজ ও বৃত্ত প্রভৃতি অঙ্কন করিতে করিতে যেমন ক্রমশঃ চিত্রের মধ্য দিয়া মনের নিগূঢ় ভাবটীও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা জন্মে, সুগভীর মনোযোগ ও অনুরাগ সহকারে শব্দ শক্তির অনুশীলন করিতে করিতে এবং মনোগত ভাবকে প্রকাশ করিবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে যেমন কবি কালক্রমে গভীরতর ভাব সমূহকেও সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন, তেমনি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত দেহ ও মনের শক্তিস্পন্দন সমূহের সাধনা করিতে করিতেই সন্তানের মধ্য দিয়া নিজের যাবতীয় কল্যাণময়ী বিশিষ্টতা বিকাশের স্বাভাবিকী ক্ষমতার প্রস্ফূরণ ঘটে। সাধনাহীন চিত্রকর কত হিসাব করিয়া, কত সন্তর্পণে, কত সাবধানতার সহিত তুলির রেখাপাত করে কিন্তু তাঁহার চিত্র প্রাণের ভাবপ্রকাশে অসমর্থ হয়। সাধনাহীন কবি অক্ষর গণিয়া ভাষাকে ছন্দোবদ্ধ করে

দেহ ও মনের প্রত্যেকটী স্পন্দনের উপরে আত্মকর্তৃত্ব লাভকল্পে তপস্যার প্রয়োজনীয়তা

এবং কত কষ্টই না করিয়া পংক্তিতে পংক্তিতে ধ্বনির মিল রক্ষা করে কিন্তু তাহার কবিতা কোনও সৌন্দর্য্য বা রসকেই সৃষ্টি করিতে পারে না। ঠিক তেমনি দেহমনের স্পন্দনশক্তির সাধনাহীন অতপস্বী নরনারী সন্তান-জননকালে শতবার পঞ্জিকা দেখিয়া এবং দিনক্ষণের চুলচেরা বিচার করিয়াও তাহাদের উৎকৃষ্ট চিন্তা, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, উৎকৃষ্ট অনুরাগ ও উৎকৃষ্ট রুচিসমূহ সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত করিতে পারে না। পরন্তু, যে ব্যক্তি যথোচিত ভাবে রেখার সাধনা করিয়াছে, তাহার তূলিকা যথেচ্ছভাবে পরিচালিত হইলেও সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ফোয়ারা খুলিয়া দেয়। যে ব্যক্তি শব্দশক্তির সাধনা করিয়াছে, তাহার লেখনী অতর্কিত প্রযত্নে শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করে এবং কবিত্ব-মধুভাণ্ডের আবরণ উন্মোচিত করিয়া দেয়। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি দেহমনের আভ্যন্তর ও বাহ্যস্পন্দন সমূহের সাধনা নিখুঁত ভাবে করিয়াছে, তাহারও এমন কি অতর্কিত অপত্যোৎপাদন জগতের মধু, জগতের অমৃত, জগতের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। তূলি চালাইলেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না, তূলির আগে সাধনা চাই। দেহ মনের স্পন্দনকে সন্তান-জননকার্য্যে ব্যবহার করিলেই সুজনসৃষ্টি হয় না, দেহমনের যাবতীয় স্পন্দনের মূলীভূতা শক্তির আগে সাধনা করিয়া লইতে হয়। এই জন্যই বিবাহ যখন রসসাধন বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টিরূপে আদর্শ মানবসমাজে গৃহীত হইবে, সেই দিন বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যই এই সাধন-জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপে অবস্থান করিবে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়াই মানব-মানবীর দেহ-মনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জীবন আনন্দের নিকেতন হইবে। যে কৌশল ও নৈপুণ্যের অধিকারী হইলে নরনারী তাহাদের কল্যাণ-সাধনাকে বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত রাখিতে সমর্থ হইবে, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য সেই কৌশল ও নৈপুণ্যের সমাবেশে দম্পতীর জীবন মানবতার পরিপূর্ণ গৌরবে বিমণ্ডিত করিবে।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে প্রচলিত আপত্তি সমূহ

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া আমাদিগকে যতগুলি আপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

(ক) বিবাহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব। কারণ, ভোগ-সামগ্রী তাহার হাতের মুঠায় রহিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি খাদ্যপানীয় পাইয়া কি করিয়া রসনা সংযত করিবে?

(খ) বিবাহিত পুরুষেরা মৈথুনে অনাসক্তি প্রদর্শন করিলে তাহাদের পত্নীরা কাম-চরিতার্থতার জন্য অবৈধ পন্থার অন্বেষণ করিবে।

(গ) বিবাহিতা নারীরা স্বামীর ভোগেচ্ছায় বাধা জন্মাইলে স্বামীরা বাসনাতৃপ্তির জন্য কুপথগামী হইবে।

(ঘ) বিবাহিতেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে অনুরাগের হ্রাস হইবে এবং তৎফলে সংসারের সুখ বিনষ্ট হইবে।

(ঙ) বিবাহিতেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া বাস করিলে দেশের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং তাহাতে জাতীয় অধোগতি সাধিত হইবে।

(চ) দাম্পত্য জীবনে মৈথুন বর্জ্জন করিলে স্বামী বা

স্ত্রীর রোগ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে আয়ুষ্কাল কমিয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে পাইবে, উল্লিখিত আপত্তিগুলি সম্বন্ধে আমরা কি বলিতে পারি।

(ক) বিবাহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা যে অসম্ভব, তাহা চিন্তা-শক্তিবঞ্চিত আত্মবিশ্বাসহীন নিরুদ্যম ব্যক্তিরই কথা। চিন্তাশীল ও আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ ব্যক্তিরা কেহই "অসম্ভব" বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যকে গার্হস্থ্য জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন না। যাহারা এখনও বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে নাই, সে সকল বালক ও বালিকাদিগকে যদি সময় থাকিতে সংযমানুকূল প্রকৃত সুশিক্ষায় প্রভাবিত করিয়া জীবনের আদর্শ এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জনই বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে অল্লাধিক সমর্থ হইবে। এই অভিমত কোনও কল্পনাবিলাসীর অতিভাষণ নহে কিম্বা শুধু প্রবন্ধ-কারেরই ব্যক্তিগত মত নহে; যাঁহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে সংযম-সাধনার প্রসার সাধনে কোন চেষ্টারই ক্রটী করেন নাই এবং শত শত স্থলে বিফলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে এক একটী সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য বা বর্জ্জনীয় বলিয়া মানিয়াছেন, এই অভিমত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লব্ধ সিদ্ধান্তের সহিত মিলিবে। বর্ত্তমান যুগের বালক বালিকারা অধিকাংশ স্থলেই অসংযমী গৃহীর সন্তান-সন্ততি বলিয়াই সংশিক্ষা পাইলেও শতকরা পঁচিশ জন বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের মান রাখিতে পারিবে না বলিয়া অনুমিত

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা অসম্ভব নহে

বালক ও বালিকাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভ্যাস থাকিলে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য লাভ অতি সহজ

হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করিবার জন্য যদি ক্রমান্বয়ে কতিপয়-পুরুষব্যাপী একাগ্র চেষ্টা চলিতে থাকে, তাহা হইলে এমন দিন এই ভারতে আসিবেই আসিবে, যেদিন শতকরা পঁচানব্বই জন বালক-বালিকাই সংযমানুকূল সৎশিক্ষা পাইলে বিবাহিত জীবনের গোপনতম অংশটুকুকেও পবিত্রতায় প্রদীপ্ত রাখিতে পারিবে। এই খানে পাঠকের স্মৃতিশক্তিকে সহায়তা করিবার জন্য আর একবার বলিয়া রাখিতেছি যে, গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যকীয় মৈথুনের বিরোধী নহে, কল্যাণোদ্দেশ্যহীন বৃথা-মৈথুনই তাহার ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী। সন্তানোদ্দেশ্যহীন যে মৈথুন, তাহাই বৃথা-মৈথুন। যে সন্তানকে সবল সুস্থ দেহমনের অধিকারী করিয়া ভূমিষ্ঠ করান যাইবে না, যাহার জন্য পুষ্টিকর আহার্য্য ও মনুষ্যত্ববর্দ্ধক সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, তেমন সন্তানকে পাইবার জন্য মৈথুনরত হইলে তাহাও বৃথা-মৈথুনেরই পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। বৃথা-মৈথুনই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যকে ধ্বংস করে, অপর মৈথুন ব্রহ্মচর্য্যের পরিপন্থী নহে।

বৃথা মৈথুন ও গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য

উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই যাহারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হইলেও সকল স্থলেই অসম্ভব নহে। মাতালেরা দুগ্ধকে হিতকর জানিয়াও তাহাতে অনাদর করিয়া যে মদ্যেই আসক্ত রহিয়াছে, তাহার কারণ তাহাদের পূর্ব্বাভ্যাস। কিন্তু পদ্ধতিবদ্ধভাবে ধারাবাহিক চেষ্টা চালাইলে মাতালেরও অভ্যাস পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। ফরিদপুরের মহাপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু স্থানীয় সাঁওতাল-বংশীয়গণের মধ্য হইতে অতি অল্প সময়েই মদ্যপানাসক্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া

পদ্ধতিবদ্ধ ধারাবাহিক চেষ্টায় পূর্ব্বাভ্যাস পরিবর্ত্তন সম্ভব

বিলাতেও বিস্ময় উদ্রিক্ত হইয়াছিল। প্রভু জগদ্বন্ধু একমাত্র নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও যে একমাত্র "পিকেটিং" দ্বারা মদ্যপায়ীদের সংখ্যাহ্রাসে সমর্থ হইয়াছিলেন, সরকারী আবগারী বিভাগের হিসাবপত্রেই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। যদি মহাত্মার বহুসংখ্যক সহকারী নেতা ও অনুচর কর্ম্মী হুজুগ সৃষ্টি করিতেই ব্যস্ত না থাকিত এবং বৃথা চেষ্টায় সামর্থ্যের পুঞ্জ অপব্যয়িত করিয়া যথার্থ কার্য্যকালে গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া না পড়িত, তাহা হইলে পনের বিশ বৎসরের মধ্যে মদ্যপানাসক্তি এতদ্দেশ হইতে যে চিরতরে নির্ব্বাসিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শত শত বৎসরের অসাবধানতা ও অকৃতি আমাদের জন্য যে দুর্ভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাকে এক তুড়ীতে উড়াইয়া দিতে না চাহিয়া, ধীর, স্থির ও বুদ্ধিকৌশল-সমন্বিত ধারাবাহিক চেষ্টা দ্বারা ব্যূহবদ্ধ আক্রমণে ক্রমশঃ পরাহত করিবারই উদ্যোগ আজ আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—তাহা হইলেই আমরা যথাযথভাবে ভবিষ্যৎ ভারতকে নির্ম্মাণ করিতে পারিব। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাতেও তেমন সঙ্ঘবদ্ধ এবং কৌশল-পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস চাই। নরনারীর কুমার-জীবন এবং বিবাহিত জীবন হইতে কাম-পঙ্কিলতাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যদি এই কার্য্যে সমর্পিতযত্ন সন্ন্যাসী কর্ম্মীরা হুজুগবহুল নিত্যনূতন কর্ম্মতালিকার মাদকতায় আকৃষ্ট না হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে এই এক চেষ্টাই চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে এক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় দাম্পত্যজীবন প্রায় সার্ব্বজনীন ভাবেই প্রদীপ্ত সাধনার জ্যোতির্ম্ময় জীবনে পরিণত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বর্ত্তমান অসংযত কদভ্যাসসমূহের প্রকৃত কারণ ও প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়া যদি এই সকল সন্ন্যাসী

কর্ম্মিগণ সকল প্রয়াস প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে আংশিক সাফল্য হাতে হাতেই পাওয়া যাইবে। এখানে বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসী কর্ম্মীর কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-কার্য্য পুরুষানুক্রমিক প্রয়াসে সম্পাদিত করিতে হইবে, তাহাতে গৃহী কর্ম্মী অপেক্ষা সন্ন্যাসী কর্ম্মীর কর্ম্মসামর্থ্য অধিকতর উপযোগী এবং একনিষ্ঠ; যেহেতু, যেস্থলে গৃহীর জীবন-সাধনা পুত্রপরম্পরায় কদাচিৎ ক্রমবর্দ্ধিত হইতে চাহে সেস্থলে সন্ন্যাসীর জীবন-সাধনা শিষ্যপরম্পরায় প্রায় সর্ব্বদাই পরিমার্জ্জিত, পরিবৰ্দ্ধিত ও পরিস্ফুট হইতে থাকে।

আংশিক সাফল্য হাতে হাতেই মিলিবে

বিবাহের বহু পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান বালক ও বালিকারা তাহাদের সুরসিক ঠাকুরদাদা,ঠাকুরমা,ভগ্নীপতি,দাদার শ্যালা প্রভৃতির নিকট হইতে হাসি-ঠাট্টায়, রংতামাসায় বিবাহিত জীবনের শুধু পঙ্কিল ছবিই দেখিয়া আসিয়াছে। বিবাহিত দম্পতীর এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থাটা এতই পাকা ও বাধ্যকর হইয়াছে যে, আত্মরক্ষণেচ্ছু বালকের জন্য জোর-জবরদস্তি এবং অকালমৈথুনভীতা বালিকার জন্য নির্দ্দয় প্রহার এই মৃত্যুমুখ সমাজের লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে কটু বলিয়া আদৌ ঠেকিতেছে না। একদিকে যেমন সৎশিক্ষার অভাব, অপর দিকে তেমন কুশিক্ষার প্রভাব। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা এইভাবে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যকে অতীব কঠিন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি বলিব, বিবাহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব নহে। যে দম্পতীর উভয়ের হৃদয়ে শ্রীভগবানের জন্য কোনও ক্রমে একটী আসন রচিত হইতে পারিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিন দিনই সংযম-রক্ষার কাঠিন্য হ্রাস পাইতে থাকিবে। যে সকল স্বামিপত্নী বিবাহের

অশিক্ষা ও কুশিক্ষা।

পূর্ব্বেই শ্রীভগবানের পরমমঙ্গল মহানামে সুদীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন যত্ন চেষ্টায় অপরাঙ্মুখ হইলে তাহারা ত' অতি অল্পকালমধ্যেই বিবাহের পঙ্কিল দুর্গন্ধময় নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া সংযমসৌরভামোদিত সুদৃঢ় উচ্চ ভূমিতে বিচরণ করিতে পারিবেনই, এমন কি বিবাহিত জীবনে যাহারা ক্লেদপঙ্কে নিজস্বতাকে হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন, তাহারাও শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে, অকপট চিত্তে তাঁহার পরমকৃপায় আশ্রয় প্রার্থী হইলে, নিশ্চিতই ক্লেদমুক্ত শুভ্রসুন্দর সুপবিত্র জীবনের অধিকারী হইবেন। হে ভারতের নবজাগ্রত দাম্পত্য সাধক ও সাধিকা! তোমরা আজ হতাশ হইও না। তোমাদের মধ্যে পরমাত্মার যে অপরিমেয় শক্তিরাশি নিহিত রহিয়াছে, আত্ম-অবিশ্বাস করিয়া তাহার প্রস্ফুটনে বাধা প্রদান করিও না। দেশের, দশের, সমাজের এবং জগতের কল্যাণের জন্য এবং তোমাদের উভয়ের পরমার্থসিদ্ধির জন্য, তোমাদিগকে আজ শত বিঘ্ন পদদলিত করিয়া পবিত্রতার সাধনা করিতে হইবে। দেহকে পরিশুদ্ধ করিয়া মনকে আবিলতাপ্রমুক্ত করিয়া তোমাদিগকে আজ সন্তান-সন্ততির জন্য সৌভাগ্য রচনা করিতে হইবে,—তোমরা আর আত্মবিস্মৃত থাকিও না। গভীর হুঙ্কারে আজ তোমরা নিজেদের সংযম-সামর্থ্যকে স্বীকার কর,তোমাদের আচরণের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণকে মর্য্যাদা দান কর, তোমাদের আদর্শের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য প্রকৃত কৌলিন্যের সৃষ্টি কর। সন্দেহবাদীর যুক্তিতর্কে তোমরা কক্ষভ্রষ্ট হইও না। দুই চারি বার পদস্খলনে তোমরা হতোৎসাহ হইও না। শ্রীভগবানকে যাহারা জীবনের সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া জানিয়াছে, তাহাদের অসাধ্য এ জগতে কি আছে? তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া যাহারা স্খলিতপদ

ভগবানের পরমমঙ্গল নামই অবলম্বন।

নিজেদের সংযম-সামর্থ্যকে স্বীকার কর

হইবে, তিনি নিজেই কি তাহাদিগকে বাহু বাড়াইয়া তুলিয়া লইবেন না? হে নারি! পুরুষ তোমার ভোগের সহায় নহেন। হে পুরুষ! নারী তোমার ভোগ্যবস্তু নহেন। পরস্পরকে ভোগ করিয়াই তোমাদের পরমা শান্তি লাভ হইবে না, একে অপরকে উন্নতির পথে সহায়তা করিয়াই তোমরা ভূমানন্দের অধিকারী হইবে। তোমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ, রসনা ও তেঁতুলের সম্বন্ধ নহে, ঘৃত এবং অগ্নির সম্বন্ধ নহে,—তোমাদের সম্বন্ধ, দীর্ঘ পথের সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সম্বন্ধ,—তোমরা একে অন্যের ধর্ম্ম-জীবনের সাথী, কর্ম্ম জীবনের সাথী, একে অন্যের শ্রমাপহারক সঙ্গী, চিত্ততাপপ্রশমক প্রাণের জন। শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল শ্রীনামের আশ্রয়ে আজ তোমরা পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা লাভ কর, সেই প্রজ্ঞার দিব্য আলোকে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া লও এবং সন্দেহবাদীর যুক্তিতর্কের উত্তর যুক্তিতর্কের দ্বারা না দিয়া জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা চিরতরে তাহাকে নিরুত্তর করিয়া দাও।

দুই চারিবার পদস্খলনে হতাশ হইও না।

(খ) বিবাহিত পুরুষেরা স্ত্রী-সঙ্গমে অনাসক্তি প্রদর্শন করিলে তাহাদের পত্নীরা কামচারিতার্থতার জন্য অবৈধ পন্থার অন্বেষণ করিবে বলিয়া যে আশঙ্কার কথা বলা হইয়া থাকে তাহা বহুলাংশেই অমূলক। কারণ, দুই চারিটী ব্যতিক্রম স্থল* ব্যতীত সর্ব্বত্রই নারী-চরিত্র একান্তই অপ্রগল্ভ

* এই সকল ব্যতিক্রম স্থলে কৌশলী স্বামী, তন্ত্রোক্ত 'বিন্দু সাধন' প্রণালীতে কার্য্য করিলে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে অর্থাৎ

এবং স্বামীর ইচ্ছানুগামী। নারী তাহার হৃদয়ের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষাকেও অতি দীর্ঘকাল হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে জানে এবং অতি বিলম্বেও ধৈর্য্য না হারাইয়া আশা-প্রতীক্ষা করিতে পারে। নারীর কাম পুরুষের অপেক্ষা আটগুণ বেশী বলিয়া কেহ কেহ যতই লম্ফঝম্প দিন না কেন, রতি-প্রার্থনা-দমনে পুরুষের অপেক্ষা নারীরই সামর্থ্য অধিক, একথা আমরা বজ্রকণ্ঠে বলিব। বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নারীর প্রতি যথেষ্টই অবিচার করিয়াছেন, এমন কি তাহাদের মনুষ্যত্বের ওজন দিতেও বাট-খাড়ায় চুরী করিয়াছেন, এই লজ্জাকর সত্য কথাটা আর ধামাচাপা দিয়া রাখা অসম্ভব। যে পত্নী সঙ্গমসুখের আস্বাদন এখনও পান নাই,

রতি-প্রার্থনা দমনে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সামর্থ্য অধিক

প্রগল্‌ভার প্রার্থনাও পূর্ণ হইবে অথচ সংযম-রক্ষার্থীর সংযমও সম্যগ্‌রূপে নষ্ট হইবে না, আংশিকরূপে মাত্র নষ্ট হইবে। ইহা কতকটা মাথা বাঁচাইবার জন্য টীকি কাটার মত দাঁড়ায় বটে, কিন্তু লোকচরিত্রজ্ঞ তান্ত্রিক আচার্য্যেরা গৃহী সাধকদের পক্ষে কামাচার-পরিবৃত সাধনের উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই ব্যবস্থার দ্বারা স্থলবিশেষে সমাজের আংশিক কল্যাণও সাধিত হইয়াছে। একথা সত্য যে, ভোগ-লালসার নিবৃত্তি কখনই ভোগপথে হইতে পারে না। কিন্তু একথাও মিথ্যা নহে যে, ভোগপথে লালসার উত্তরোত্তর বর্দ্ধন হইতে হইতে এমন একটা সময় আসিয়া পড়ে, যখন লালসার উপযোগী বিষয় এই জড় জগতে একান্ত অপ্রাপ্য হয়। তখন ভোগার্থী বৃহত্তর কিছুকে চাহে, কিন্তু সে বুঝিতে পারে না, সেই বৃহত্তর বিষয়টা কি, যাহা তাহার লালসা চঞ্চল মনকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারে। যাহাতে মনের এই অবস্থাতে ভোগার্থী তাহার ভোগ্য বস্তুকে শ্রীভগবানের মধ্যে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভগবানেরই প্রেমরসে মজিয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই তান্ত্রিক আচার্য্যেরা সাধারণ মানব-মানবীর জন্য ভোগাচারে ভগবৎ-সাধনার এবং ভগবৎ-সাধনায় ভোগাচারের স্থান করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার স্বামী যদি নিজে সংযতচেতা অথচ **বিবেচক** এবং **প্রেমিক হৃদয়** ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে ইচ্ছা করিলে তিনি অতি দীর্ঘকাল স্বীয় পত্নীকে দেহলালসার সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বতোভাবেই দূরে রাখিয়াও নিরতিশয় অনুরক্তা এবং একান্ত পতিগত-প্রাণা রাখিতে পারেন। কারণ, স্বামিপত্নীতে ভালবাসা যতই নিবিড় হউক না, পরস্পরের সরলতা যতই গভীর হউক না, মুখ ফুটিয়া দেহ সমর্পণের প্রস্তাব স্ত্রীর পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব। স্বামী যতদিন না পত্নীর দেহকে গ্রহণ করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত পত্নীর মনে যাহাই থাকুক, তাহার পক্ষে দৈহিক প্রয়াসের দ্বারা স্বামীকে আসক্ত ও অনুগত করিবার চেষ্টা প্রায় অভাবনীয়। একবার অসংযমের আস্বাদন পাইলে সুশীলা নারীও যৌবনের উদ্দাম প্রকৃতিবেশে ব্যাঘ্রিনী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু **কৌশলাভিজ্ঞ** ভগবৎ-প্রেমিক স্বামী ইচ্ছা করিলেই তাহার বাসনার দুর্ব্বার স্রোতের গতি ফিরাইয়া এই দুঃখময় মর্ত্ত্যালোকে সুখসুন্দর স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করিতে পারেন। পত্নীর কামচরিতার্থতায় স্বামী যদি নিজেকে যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে না দেন, তাহা হইলেই যে পত্নী পরপুরুষগামিনী হইবেন, নারী চরিত্রে অনভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাহীন নীচবুদ্ধি ব্যক্তিরাই এইরূপ অসঙ্গত আতঙ্কে অস্থির হইবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নারীর চিত্তবৃত্তি এত দুর্ব্বল, হীন বা জঘন্য নহে। যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীজাতিকে আমরা সমাজের নিকৃষ্টতম মনোভাবগুলির সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিতে বাধ্য করিয়া এবং তাহাদের লোককল্যাণী ক্ষমতার ব্যাপকতাকে বলিতে গেলে প্রায় কায়মনোবাক্যেই অস্বীকার করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে নিজস্ব মহিমা হইতে শত প্রকারে পরিভ্রষ্ট

দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে স্বামী চেষ্টা করিলে অতি সহজেই সংযম পালন করিতে পারেন।

করিলেও, আজও নারী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নিন্দনীয় হয় নাই। ভারতে যত স্বামিবতী হতভাগিনী পরপুরুষ-গামিনী হইয়া নিজেদিগকে পতিতা এবং বংশকে নরকাচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই পরনারীরত মদ্যপ পতি-দেবতার অকথ্য অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি জর্জ্জরীভূতা হইয়াই পরিশেষে জীবনের দুঃস্থতম মুহূর্ত্তে পাপপন্থা গ্রহণ করিয়াছে। কুলত্যাগিনী এই পরমদুঃখিনী মন্দভাগিনীরা কুলবতী সতী-শিরোমণিদেরও মুখ ঘৃণায় লজ্জায় পাংশুবর্ণ এবং মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু এই রূপোপজীবিনী দুর্ভাগিনীদের পতনের প্রথম ইতিহাস যখন মনে মনে আলোচনা করি, তখন যে শোকে, দুঃখে ও বেদনায় অধীর হইয়া পড়ি! যে পুরুষের জাতি ইহাদিগকে কোথাও বা অত্যাচারের বিকট বিকর্ষণে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কোথাও বা প্রলোভনের মদির আকর্ষণে টানিয়া আনিয়া, আমৃত্যু পাপের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে বাধ্য করিল, সেই পুরুষের জাতিকেই জগতের সকল অপরাধের নাটের গুরু জানিয়া ব্যথায় যে অবশ হইয়া পড়ি! তথাপি চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখ, পদাঘাত যাঁহার নিত্যকার অভিনন্দন, অনাহার যাঁহার নিত্যকার স্বামিভক্তির পুরস্কার, বারিবর্ষণের জন্যই যাঁহার কুরঙ্গচক্ষুর্দ্বয়, নির্ম্মম তিরস্কার-বাক্যই যাঁহার কর্ণরসায়ণ, ভ্রষ্টচরিত্র লম্পট স্বামীর সেই একপরায়ণা সতীপ্রতিমা পত্নীদের সংখ্যা একপরায়ণ স্বামীদের অপেক্ষা কত বেশী। মৃত্যুতুল্য দুঃখকষ্টের বজ্রাঘাত সহিয়াও যাঁহারা দুশ্চরিত্র অধার্ম্মিক স্বামীরই চরণযুগল সবলে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, তুমি কি বলিতে চাহ যে, তাহাদেরই এক সহোদরা ভগ্নী

নারী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নিন্দনীয় নহে।

অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরাই নারীর দুশ্চরিত্রতার প্ররোচক

স্বামীর স্নেহমমতার সর্ব্বাংশে অধিকারিণী হইয়াও শুধু দেহসুখের সাময়িক লোভেই পরপুরুষস্পর্শের দ্বারা দেহকে কলুষিত করিবেন ?

ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থী স্বামী নিজ পত্নীকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গিনী জানিয়া নিয়ত কল্যাণময়ী সুশিক্ষায় মণ্ডিত করিতে চাহিবেন। একে অন্যকে পরমাত্মার বিকাশ-বিগ্রহ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদের সম্বন্ধ অনেকটা গুরুশিষ্যের ন্যায়। মৈথুনের অভাব ইহাদের প্রীতিকে বর্দ্ধিতই করিবে, মৈথুনের বাহুল্য সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবুদ্ধির ধ্বংশসাধন করিবে। পত্নী যখন পতিকে শ্রদ্ধা করিবার কারণ পায়, তখনই তাঁহাকে জীবনের জীবন, সর্ব্বস্বধন, যৌবনাধিরাজ শ্রীভগবান বলিয়া মনে প্রাণে স্বীকার পায়। আর, যখন স্বামীর দেহকেই শুধু তাহার প্রয়োজন, তখন মনে মনে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের সমর্থন করে।

স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কতকটা গুরু-শিষ্যের ন্যায়

হে ভারতীয় নববিবাহিত যুবক ! যদি তোমার পত্নীকে যথার্থই তুমি সহধর্ম্মিণীরূপে পাইতে চাহ, জীবন-সাধনার সহায়তাকারিণী মহাশক্তিরূপে দেখিতে চাহ, হতাশার আশারূপে, বেদনার সান্ত্বনারূপে তাঁহার সুখ-সাহচর্য্যকে লাভ করিতে চাহ এবং পরিশেষে যদি তাঁহার হৃদয়-মনকে নিঃশেষে অধিকার করিয়া লইতে চাহ, তবে জানিও, বিবাহের পরমুহূর্ত্ত হইতেই পাশব স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া না দিয়া উপযুক্ত কালের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে এবং এই সময়টুকুর প্রত্যেকটী

বিবাহের পরমুহূর্ত্তেই ভোগ স্রোতে ভাসিও না।

মুহূর্ত্ত তোমার সঙ্গিনীর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য তোমাকে চেষ্টা পাইতে হইবে। মানব-জীবনের যথার্থ মহিমার কথা একবার যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পার এবং স্বয়ং তুমিও যে মহিমার সেই মহাসম্পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ, তোমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা যদি তাঁহার মনে সেই ধারণা দৃঢ়মূল করিয়া তুলিতে পার, নিশ্চিত জানিও, তাহা হইলে তুমিই তাঁহার কল্পনাগগনের একমাত্র সুখসূর্য্য রহিবে, তুমিই তাঁহার সকল কল্যাণী প্রেরণার মূল উৎস থাকিবে। তুমিই তখন তাঁহার সুখ এবং সমৃদ্ধি, তুমিই তখন তাঁহার আনন্দ এবং প্রেম, তুমিই তখন তাঁহার জীবন এবং যৌবন, তুমিই তখন তাঁহার রূপ এবং রস। সেই দিন তোমার তৃপ্তিতেই তাঁহার পরমা তৃপ্তি, তোমার সৌভাগ্যেই তাঁহার মহাসৌভাগ্য, তোমার শান্তিতেই তাঁহার নিত্যা শান্তি।

(গ) পত্নীরা আত্মসংযম অবলম্বন করিয়া স্বামীর ভোগেচ্ছায় বাধা জন্মাইলে কামাতুর স্বামীরা বিপথচারী হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়া থাকে, তাহা একেবারে অমূলক নহে। এই আপত্তিটী খণ্ডন করিবার মত কোনও প্রবল যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। **যে-সমাজে নারীর বহুপতিত্ব নিষিদ্ধ হইবার বহু সহস্র বৎসর পরেও আজ পর্য্যন্ত পুরুষের বহুপত্নীত্ব অচল হইল না, নারী যে-সমাজে পুরুষের পক্ষে থালা, ঘটী, বাটীর ন্যায় একটা সম্পত্তি মাত্র অথবা তৈল,**

পত্নীর সংযমাবলম্বনে স্বামীর বিপথচরণের আশঙ্কা

মৎস্য, মাংসাদির ন্যায়, একটা ভোগ্যবস্তু মাত্র, এবং যে-সমাজে ইচ্ছা করিলেই একটীকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের বাজার অথবা গণিকার হাট হইতে মনের মতন আরও দুই দশটী অনায়াসে আনয়ন করা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, সেই সমাজে সংযতস্বভাবা পত্নীর পক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও বৃথা-মৈথুন পরিহারের চেষ্টায় সাফল্যের আশা খুব কম। যে-সমাজে একটা মিথ্যা অপবাদেই নারীর লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইতে পারে এবং সামান্য স্বার্থের জন্য স্বয়ং স্বামীও অনেক সময় মিথ্যা অপবাদের দ্বারা স্ত্রীর উপরে আক্রোশ মিটাইবার চেষ্টায় লজ্জিত হয় না, অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে কুলটাসঙ্গ করিলেও পুরুষকে কেহ কাণে ধরিয়া নিমন্ত্রণের পংক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করে না, যে-সমাজে সমগ্র জীবন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিয়াও অপবাদগ্রস্তা অথবা স্বামীরই পৌরুষের অভাবহেতু দুর্ব্বৃত্ত পশুকর্ত্তৃক ধর্ষিতা নির্দ্দোষিণী নারী একটুকু অনুকম্পার আশ্রয়

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-জাতির প্রতি অকথনীয় অবিচার।

পায় না, অথচ সর্ব্বাঙ্গ উপদংশ-বিষে খসিয়া পড়িলেও পুরুষের সামাজিক কৌলিন্য একরতি কমে না, সেই সমাজে যথার্থ সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিতা পত্নীর পক্ষেও উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় অনেক সময়ই উপেক্ষা করিতে হইতেছে। স্বামী যদি সরলস্বভাব হন, তাহা হইলে বুদ্ধিমতী পত্নী ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় কৌশলে জয় করিয়া লইয়া কালক্রমে সংযমের পথে পরিচালন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বুদ্ধিমতী ও কৌশলাভিজ্ঞা পত্নীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই অতি অল্প। আর, স্বামী কুটিল-প্রকৃতি হইলে মহাবুদ্ধিমতীর পক্ষেও কিছু করিয়া ওঠা অতীব কঠিন। তবে, একটী কথা এই যে, স্বামীর অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে অসমর্থা হইয়া যে-সকল পত্নী নিজেদিগকে কামের ক্রীড়ণকরূপে ব্যবহৃত হইতে না দিয়া পারিতেছেন না, তাঁহারা যদি নিয়ত মনে-প্রাণে শ্রীভগবানের চরণে তাঁহাদের মনের বেদনা জানাইতে থাকেন, তবে অনাথশরণ দীনদয়াল কাঙ্গালের-ঠাকুরের কৃপার বাতাসে তরী একদিন উজান বহিতে আরম্ভ করিবেই। প্রার্থনার শক্তি অপরিসীম। স্বামীর জীবনের যে অপূর্ণতাগুলি তাহাকে বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিতেছে, ভালবাসার-জন কেহ যদি ভগবানের কাছে সেই অপূর্ণতা দূর করিয়া দিবার জন্য একাগ্র প্রাণে প্রার্থনা করে, তবে তাহা সফল না হইয়াই পারে না। বিশেষতঃ ভগবৎ-সমর্পিত-প্রাণা নারীর গর্ভজাত সন্তানেরা প্রত্যেকেই মায়ের নিকট হইতে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় কল্যাণ-প্রেরণা লইয়া আসিবেই।

শ্রীভগবান বিপন্নের বন্ধু

(ঘ) বিবাহিতেরা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলে স্বামীপত্নীর অনুরাগের হ্রাস হইবে এবং তাহার ফলে সংসারের সুখ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ

আশঙ্কা প্রকৃতই অমূলক। কারণ, যথার্থ অনুরাগ একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা হইতেই জন্মে, শ্রদ্ধাতেই তাহা বর্দ্ধিত হয়। যাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই, যাহার প্রতি আমার নিয়ত-প্রশংসমানা দৃষ্টি নাই, যাহার চিত্তা-কর্ষিণী গুণাবলী আমাকে সতত মুগ্ধ করে না, তাহার প্রতি আমার যে অনুরাগ, তাহা নিতান্তই হেয় এবং ক্ষণভঙ্গুর। প্রথম দর্শনের ভালবাসা (Love at First Sight) প্রকৃত প্রস্তাবে দেহপিপাসা বা রূপলালসারই নামান্তর,—দেখিয়া দেখিয়া পুরাতন হইয়া গেলে এইরূপ ভালবাসার বস্তুটী আর নয়নানন্দ রহে না। দেহের জন্য দেহের যে আকর্ষণ, তাহা দেহকে পাইবার পরে আর থাকে না। তখন প্রথম-দর্শনের ভালবাসা অতি-দর্শনের বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়। পরন্তু, শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া যে ভালবাসার সৃষ্টি, তাহার লক্ষ্য দেহটার মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, সে তাহার প্রিয়জনের সসীম বিকাশের মধ্যে একটা অসীম চৈতন্যের স্পর্শ পাইতে চাহে, দেহকে পাইল কি না-পাইল সে দৃষ্টি তাহার নাই, পিপাসা তাহার অফুরন্ত, প্রাপ্তিও তাহার অফুরন্ত, পাওয়ার এখানে শেষ নাই এবং বিতৃষ্ণার এখানে অবকাশ নাই। ভ্রমরস্বভাব মানব-মানবী এক ফুলের মধুপান করিয়াই অপর ফুলে যাইয়া বসিতে চায়। আর, চাতকস্বভাব মানব-মানবী একমাত্র পূর্ণচন্দ্রমারই জ্যোছনা-মাখান অমিয় পানের জন্য আমৃত্যু-একনিষ্ঠায় সুনীল গগনের মলয়-তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়। দেহের আকর্ষণই যাহাদের অনুরাগের মূল, তাহারা সঙ্গীর বা সঙ্গিনীর দেহটাকে মোহমত্ততার বশে পরম-সুখের আকর ভাবিয়া খুব কয়েক-দিন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তারপর

শ্রদ্ধাই
স্থায়ী অনুরাগের
মূল।

দৈহিক
আকর্ষণজাত অনুরাগ
ক্ষণস্থায়ী।

ভ্রমর-ধর্ম্মীর
প্রেম ও
চাতক-ধর্ম্মীর
প্রেম।

অনুরাগের জোয়ারে ভাঁটার টান অনুভব করে। ইহারা ভ্রমরধর্ম্মী। পারস্পরিক শ্রদ্ধাই যাহাদের অনুরাগের মূল, তাহারা সঙ্গীর বা সঙ্গিনীর দেহটাকে প্রায় ভুলিয়াই যায় এবং একের চিন্তার উদারতা, বাক্যের মধুরতা ও কার্য্যের সরসতা অপরকে এমন এক অসীম কল্পনার গহন-নীলিমার মলয়-কম্পিত তরঙ্গ-প্রবাহে ভাসাইয়া দেয়, যেখানে প্রাণপ্রিয়কে লক্ষ বৎসর বুকে ধরিয়াও আত্মহারা চিত্ত চিরবিরহের সুমধুর জ্বালা ভুলিতে চাহেনা, লক্ষ বৎসর প্রাণের জনকে চোখে চোখে রাখিয়াও দেখিবার সাধ আর মিটে না। ইহারা চাতক-ধর্ম্মী। ইহাদের প্রেম চিদায়তন বিদেহী প্রেম, তাই ইহা অনন্ত, অফুরন্ত। সংযম-সাধনা এই প্রেমকে সুলভ করে, সহজ-প্রাপ্য করে। ভ্রমরের প্রেম সীমাবদ্ধ ক্ষণিক প্রেম, দেহায়তন ভোগলুব্ধ প্রেম, কারণ ইহাতে দেনা-পাওনার হিসাবটাই সব। চাতকের প্রেম অসীম চিরস্থায়ী, কারণ ইহাতে দেনা-পাওনার বিস্মৃতিটাই মুখ্য। ভ্রমর পাইলেই খুসী, না পাইলে অখুসী। চাতক পাইলেও যেমন, না পাইলেও তেমন, প্রাণপ্রিয়কে ভাল বাসিয়াই সে তৃপ্তিমান্। **এই যে আদর্শ প্রেম, ইহা ব্রহ্মচর্য্য কল্পপাদপেরই দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত অপূর্ব্ব ফল।** অল্পেই যাহাদের দৃষ্টি, অল্পেই যাহাদের তুষ্টি, সেই দেহভোগী, রূপলোভী, স্তোকসুখী মানবের উহাতে অধিকার কোথায়? **দেহসুখের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর সুখকে যাঁহারা দাম্পত্যজীবনের যুগল-সাধনায় লাভ করিতে প্রয়াসী, সেই বৃথা-মৈথুন-পরিত্যাগী স্বামী এবং পত্নীরই প্রেমরূপ অমৃতফলের আস্বাদনে সৌভাগ্য**

বৃথা কথায় কাণ দিও না

ঘটে। হে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ যুবক যুবতী! তোমরা আজ বৃথা কথায় কাণ না পাতিয়া নিজেদের ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট ঔরসে এবং সংযম-শুদ্ধ জঠরে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবকে জন্মদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা তোমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত করিবে বলিয়া অনভিজ্ঞেরা যে হট্টগোল সৃষ্টি করিতেছে, তোমরা তাহাতে ধীর ও অচঞ্চল থাকিয়া আত্মবিশ্বাসের সহায়তায় দিনের পর দিন জীবন-গঠন করিতে যত্নবান ও যত্নবতী থাক। নিয়ত আত্মোন্নতির চেষ্টা দ্বারা তোমরা পরস্পরের শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্য ও যোগ্যা হও এবং শ্রদ্ধা-সম্বর্দ্ধিত অপরিমেয় প্রেমের দ্বারা একে অন্যের হৃদয় ও মনকে বেষ্টন করিয়া ধর। সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য **তোমরা তোমাদের আত্মগঠনপরায়ণ বাহুযুগলকে বিস্তারিত কর এবং যে-বাহু দেহের প্রার্থনাকে আত্মার প্রার্থনা অপেক্ষা বড় করিয়া গড়ে, সেই কামপরায়ণ বাহু-যুগলকে গুটাইয়া আন।** নিশ্চিত বিশ্বাস করিও, জগতের যাঁহারা দুঃখদূর করিবেন, বিশ্বকে যাঁহারা দৈন্যমুক্ত করিবেন, তোমাদের বিবাহিত জীবন তাঁহাদেরই ভূমিষ্ঠ হইবার ভূমিকা। তোমাদের দাম্পত্য শুদ্ধতায় তোমাদেরও কল্যাণ, তাঁহাদেরও কল্যাণ, দেশের, দশের, জাতির ও সমাজের প্রত্যেকের কল্যাণ। আত্মকল্যাণের মুখ চাহিয়া তোমরা তোমাদের অমিতাচার পরিহার করিও, **ভবিষ্যৎ যুগে তোমাদেরই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যাঁহারা স্বভাব-ব্রহ্মচর্য্যের অমূল্য সম্পদ লইয়া জীবনের পথ চলিবেন, তাঁহাদের কল্যাণের**

মুখ চাহিয়া তোমরা চিত্তের দুর্ব্বলতার সময়ে আত্মদমন করিয়া স্বস্থ হইও।

(ঙ) দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে লোক-সংখ্যা কমিয়া যাইবে বলিয়া যে জুজুর ভয় দেখান হয়, তাহাও সম্যক্ ভিত্তিহীন। বরঞ্চ একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য্য শুধু যে লোক-সংখ্যাই বর্দ্ধিত করিবে, তাহা নহে, নবজাত সন্তান-সন্ততিগুলিকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা শক্তিতে, সামর্থ্যে, বুদ্ধিতে, মেধায় ও মনীষায় শ্রেষ্ঠ করিবে। বিভিন্নপন্থী সমাজ-সংস্কারকেরা নিজ নিজ কর্ম্মতালিকার প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন জাতীয় ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, **শিশুমৃত্যুর আধিক্যই যে জাতীয় ক্ষয়ের প্রধানতম লক্ষণ এবং প্রাগ্‌দাম্পত্য ও বিবাহিত জীবনের অদমিত অসংযমই যে শিশুমৃত্যুর প্রধানতম কারণ,** এই কথাটীকে অস্বীকার করিয়া যাইবার উপায় কাহারও নাই। বিবাহিত জীবন হইতে যদি অসংযম দূরীভূত হয় এবং কুমার ও কুমারী-জীবনে কঠোর আত্মগঠনের পরে যদি নরনারী গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে শিশুমৃত্যু প্রশমিত না হইয়াই পারিবে না। ব্রহ্মচারী জনকজননীর সন্তানেরা স্বভাবতই সুস্থ, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী হইবেন এবং অকালমৃত্যু স্বভাবতই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তাঁহাদের রোগ-প্রতিরোধক সামর্থ্যও বর্ত্তমান মানবদের অপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে। দুর্ভিক্ষের

লোক-সংখ্যা হ্রাসের জুজুর ভয়।

শিশু-মৃত্যুর আধিক্যই জাতীয় ক্ষয়ের প্রধানতম কারণ

দাম্পত্য সংযম শিশুমৃত্যু প্রশমিতই করিবে।

মুল কারণ "আলস্য শত্রুকে" এবং অপরাপর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণ সমূহকে সমূলে ধ্বংস করিতে তাঁহারা অধিকতর সমর্থ হইবেন। রণক্ষেত্রে কোটি কোটি মানব-জীবন বলি দিলেও নিজেদের গৃহত্যক্তা সহধর্ম্মিণীদের জঠরে বা ক্রোড়ে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বীজ অথবা অঙ্কুর তাঁহারা রক্ষা করিয়া যাইতে পারিবেন। সর্ব্বব্যাপিভাবে গৃহিজীবনকে যদি একবার সংযম-পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ভারত যে অভ্যুত্থান লাভ করিবে, তাহা হাহাকার-সঙ্কুল মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রতাপে অথবা নরশোণিতলুব্ধা তৃষাতুরা ধরিত্রীর বক্ষে কুরুক্ষেত্রের পুনরভিনয়ে আর কখনও মাথা নত করিবে না।

সম্প্রতি ইটালিতে মুসোলিনী এবং জার্ম্মেনীতে হিট্‌লার প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ নিজ নিজ জাতির জনসংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য নানাভাবে প্রয়াস-পরায়ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের দেশের অনেকের অনুকরণ-স্পৃহা জাগ্রত হইতে পারে। বহু সন্তানের জনক-জননীদিগকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়া প্রত্যেক দম্পতীকে অত্যধিক পরিমাণে অপত্যোৎপাদনে উক্ত দেশদ্বয়ে উৎসাহিত করা হইতেছে। কিন্তু যে কারণ বশতঃ ইটালি ও জার্ম্মেনীকে বেপরোয়াভাবে সন্তান-সংখ্যা-বর্দ্ধনে চেষ্টা পাইতে হইতেছে, ভারতবর্ষে ঠিক অনুরূপ কারণ যদি বিদ্যমান থাকেও তথাপি রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার অভাবে নবজাত সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষাদানের সৌকর্য্য নাই বলিয়া, নবজাত শিশুগুলিকে দারিদ্র্য-প্রভাবজ নানা মারাত্মক ব্যাধির ব্যূহবদ্ধ আক্রমণ হইতে রক্ষা করার কোনও উপযুক্ত সম্ভাবনাও নাই। ফলে, অফুরন্ত সন্তান জননের প্রয়াস বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কোনও রাজনৈতিক উপযোগিতাও রাখে না। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের এবং তৎপরবর্ত্তী

য়ুরোপের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির আন্দোলন

বল্কান-সমরের পরে বল্কান প্রদেশে অভ্যুদগত বুল্‌গেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বহু-বিবাহের প্রচলন করিয়াও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু যেই কারণে সেই চেষ্টা চলিয়াছিল, ভারতে সেই কারণের অসদ্‌ভাব। মহম্মদীয় ধর্ম্মে জনসংখ্যা বর্দ্ধনার্থে বহু-বিবাহকে সমর্থন করিতে কৃপণতা নাই,—কারণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার-কালে ইস্‌লাম-বিদ্বেষী প্রতিবেশীদের অন্যায় নির্য্যাতন বশতঃ সাময়িক ভাবে অতি দ্রুত স্বকীয় সম্প্রদায়ে জনবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছিল। কিন্তু দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্যভাবে অফুরন্ত সন্তান-জনন করিয়া গেলে সমাজ কিরূপ লোকসমূহের দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহাও চিন্তনীয়। আজ ইস্‌লামের উপাসক হইয়াও মুস্তাফা কামালপাশাকে তলোয়ারের জোরে বহুবিবাহ রুদ্ধ করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন সমাজে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন সময়ে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় জীবনে তাহার অন্ধ অনুকরণ করিতেই হইবে,এমন কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। আবার, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বেপরোয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উৎপাতে অধীর হইয়া ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র (United States) প্রভৃতি দেশে একদল সামাজিক আন্দোলনকারী কৃত্রিম জন্ম-নিরোধের কদর্য্য ও নিন্দনীয় চেষ্টা করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে অবাধ জন-বৃদ্ধির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিই প্রকটিত করিতেছে এবং ইহা হইতে এই কথাই প্রতীত হয় যে, জন্মসংখ্যা যেন তেন প্রকারেণ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মস্ত বড় একটা কাজ হইয়া গেল না, সময় সময় জন্মবৃদ্ধিও সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। অবশ্য, ভারতে জন-বৃদ্ধি অনাবশ্যক, এইরূপ কথা আমরা বলিতেছি না। পরন্তু তালে বেতালে জন-বৃদ্ধি ঘটাইলেই যে তাহাদ্বারা ভারত মঙ্গলান্বিত হইবে, এমন অর্থহীন যুক্তির সঙ্গতিকেই মাত্র আমরা অস্বীকার করিতেছি।

এস্থলে আর একটী কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনও দেশের জন্ম এবং মৃত্যুর হার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যখনই যে দেশে জন্মের সংখ্যা বাড়িয়াছে, তখনই সে দেশে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ফলে জন্মসংখ্যার বর্দ্ধনে দেশের লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই। **লোক-সংখ্যা-বর্দ্ধনের কৌশল নিরবচ্ছিন্ন সন্তান-জননকারীর হস্তে নহে, মৃত্যুসংখ্যা-হ্রাসকারীই দেশের প্রকৃত লোকসংখ্যার বর্দ্ধনকারী,** কারণ মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস করিবার উপায়ই যথার্থই প্রস্তাবে লোক-সংখ্যা বর্দ্ধনের নির্ভুলতম উপায়। তথাপি, যুক্তি দ্বারা বাধ্য না হইলেও তর্কস্থলে যদি একথা স্বীকার করিয়া ও লই যে, জন্মসংখ্যা বর্দ্ধনের দ্বারা লোকসংখ্যা প্রকৃতই বাড়ে, তাহা হইলেও প্রমাণিত হয় না যে, ইহাতে জাতীয় উন্নতি বর্দ্ধিত হয়। **অন্ধ, আতুর, অনাথ, অক্ষমের দলবৃদ্ধিতে প্রকৃতই কি সমাজের বলবৃদ্ধি হয়, না বলক্ষয় হয়? যাহারা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে পারিবে না, নিজেদের দুঃখ নিজেরা ঘুচাইতে পারিবে না, নিজেদের দুর্ভাগ্যকে নিজেরা চূর্ণ করিতে পারিবে না, তাহাদের দ্বারা কি দেশ ও সমাজ লাভবান্ হয়? চিরকাল যাহারা পরপদানত হইয়া থাকিবে, চিরকাল যাহারা পরের মুখে ঝাল খাইবে, চিরকাল যাহারা পরের অনুগ্রহের কাঙ্গাল হইয়া রহিবে, চিরকাল যাহারা পরের দেওয়া ভিক্ষান্নকে**

মৃত্যুসংখ্যার হ্রাসকারীই দেশের প্রকৃত লোক-সংখ্যা-বর্দ্ধনকারী

অক্ষমের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে সমাজের বলবৃদ্ধি হয় না

সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করিয়া আত্মশক্তির ব্যবহারে অলস ও কুণ্ঠিত রহিবে, সেই ভিক্ষুকের পালের জন্ম দিয়া লোকসংখ্যাবর্দ্ধন করিলেই কি ভারতবর্ষ তাহার যথার্থ গৌরব ও মহিমার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে? একটী দুইটী প্রকৃত মানুষের মূল্য অপেক্ষা দুই দশ লক্ষ শূকর-শাবকের মূল্যকে অধিক বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিলেই কি আমাদের মুক্তিবঞ্চিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মার অফুরন্ত তৃষ্ণার অবসান ঘটিবে? কোটি কোটি নপুংসকের বাচ্চা দিয়া আসমুদ্র হিমাচল বন্যাপ্লাবিত করিয়া ফেলিতে পারিলেই কি ভারতীয় জাতির সেই মহাঅভ্যুদয় লাভ হইবে, যাহার জন্য আজ ছোট-বড়, ধনি-নির্ধন প্রত্যেকের প্রাণে এক অদম্য অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষার জাগরণ অনুভূত হইতেছে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে অসহনীয় যন্ত্রণা এবং দৈহিক অধঃপতনের শাস্তি সহিয়া জননীরা বৎসরের পর বৎসর অবিশ্রামে সন্তান প্রসব করিয়া যাইতেছেন, তাহা যে শুধু নারীজাতিকেই মৃত্যুম্লান করিতেছে, তাহা নহে, তাহা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই জন্য পরোক্ষভাবে মৃত্যুই আহরণ করিতেছে। তদুপরি, অকাল-মরিষ্ণু বহুসংখ্যক সন্তান-সন্ততির গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষার ব্যবস্থায় যে পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইতেছে এবং এক এক জনের মৃত্যুর দ্বারা সেই ব্যয় ও পরিশ্রম যে ভাবে ব্যর্থ

অবিশ্রান্ত সন্তান প্রসব স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে।

হইয়া যাইতেছে, তাহাতে একথা বলা চলে না যে, ডজনের বা কুড়ির হিসাবে সন্তান জনন করিয়া গেলে মরিয়া তরিয়া যাহারা থাকিবে, তাহারা জাতীয় উন্নতিরই সাক্ষ্য যোগাইবে। বরঞ্চ যে কুসুমকলিগুলি ফুটিবার আগেই ঝরিয়া গেল, যদি তাহারা মোটেই জন্ম পরিগ্রহ না করিত, তাহা হইলে যেগুলি যাইতে যাইতে রহিয়া গেল, নিতান্তই মরার মত রহিয়া গেল, সেই নির্জ্জীব দুর্ভাগাগুলি বহুপ্রসবক্লান্তা রুষ্টস্বভাবা জননীর তর্জ্জনের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যসুখহৃষ্টা প্রফুল্লাননা জননীর স্নেহ প্রাণ ভরিয়া পাইত, দারিদ্র্য-পীড়িত রুক্ষচেতা পিতার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হৃষ্টচেতা পিতা তাহাদিগকে অধিকতর পুষ্টিকর আহারীয় যোগাইতে পারিত, তাহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্মেষের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে অপরাঙ্মুখ হইত।

বহু সন্তান-সন্ততি জননের অর্থনৈতিক দিক্

তাই বলি হে ভারতপ্রেমিক যুবক-যুবতী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আজ তোমরা দাম্পত্য দায়িত্বের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া লও, স্থির বুদ্ধিতে আজ তোমরা পারিবারিক জীবনের সুখ ও দুঃখের প্রকৃত নিদান বুঝিয়া লও। **একপাল স্বদেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী অন্নের কাঙ্গালের জন্ম দিয়া তাহাদের চিরদারিদ্র্য-দুঃখের দায়িত্ব তোমরা নিজেদের স্কন্ধে লইবে কি না, আজ তাহা ভাবিয়া দেখ। হাহাকার-পরায়ণ তীর্থকাকের গোষ্ঠির জন্ম দিয়া নিজেদের বিধিদত্ত দুঃখকষ্টের পরিমাণ ও গভীরতা বাড়াইয়া লইবে কি না, আজ তাহা বুঝিয়া দেখ।**

বহু সন্তান-জননের পথে? না, সংযমের পথে?

নিত্যরোগকাতর অস্বাস্থ্যপীড়িত সজীব মৃতদেহগুলির জন্ম দিয়া চিকিৎসকের দর্শনীর সাথে সাথে প্রতিগৃহে মিশরের শবদেহের প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা পাকা রকমে করিয়া লইবে কি না, তাহা আজ বিচার করিয়া দেখ। প্রতিবৎসরেই একটী করিয়া নবজাত শিশুকে তোমার অস্বাস্থ্যকর অন্নহীন গৃহকোণে নিমন্ত্রণ দিতে গিয়া শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যুর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে দেশ ডুবাইয়া দিবে কি না, তাহা আজ ভাবিয়া দেখ। দেশের লোক-সংখ্যা বাড়াইবার মিথ্যা যুক্তিতে ভুলিয়া তোমরা নিজেদের দেহের স্বাস্থ্য, মনের বল, চিত্তের স্বাধীনতা ও হৃদয়ের সজীবতা বিসর্জ্জন দিবে কি না, তাহা আজ নির্দ্ধারিত করিয়া লও। তোমরা আজ তোমাদের অন্তরাত্মাকে তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ পথে তোমাদের প্রকৃত মঙ্গল, বহু-সন্তান-জননের পথে, না সংযমের পথে?

অবশ্য, জনন-নিরোধের পাশ্চাত্যপন্থা লইয়াও কেহ কেহ অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু তাহার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

(চ) দাম্পত্য জীবনে মৈথুন বর্জ্জন করিলে স্বামী বা স্ত্রীর দেহে রোগ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের আয়ুষ্কাল হ্রাস প্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের বিরুদ্ধে এক প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সত্যতা কতটুকু আছে

তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিব। রোগ বাস্তবিকই জন্মে কি না তদ্বিষয়ে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা আয়ুঃক্ষয়-সম্পর্কিত আপত্তিটুকুরই বিচার করিব।

ধরা যাউক, যেন দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে বাস্তবিকই আয়ুঃক্ষয় হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া অবিরাম কামচর্চ্চা চলিলেই কি আয়ুর বৃদ্ধি হইবে? দাম্পত্য সংযমে আয়ুর হ্রাস হইতে পারে বলিয়া তর্কস্থলে বরং স্বীকারই করিলাম। কিন্তু অফুরন্ত ইন্দ্রিয়-সঙ্গমে আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বাতুলেও বিশ্বাস করিবে না।

তারপর রোগের কথা। শত শত সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিনিয়ত স্ত্রী-সম্ভোগ বা স্বামি-সংসর্গ করিতেছে,—কিন্তু তাহারা কি কেহ নীরোগ? মৈথুন-বর্জ্জনেরই ফলে বহু রমণী হিষ্টিরিয়া বা যোষিতাপস্মার রোগে আক্রান্তা হইয়া থাকেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যদি সত্য হয়, তবে, সম্ভোগ বর্জ্জন করেন নাই, এমন সহস্র সহস্র রমণী কেন আমার আশ্রম-দুয়ারে হিষ্টিরিয়া রোগারোগ্যের আশায় উপনীতা হন? অমৈথুন জরায়ুজ রোগের কারণ নহে, অতি-মৈথুনই প্রধানতম কারণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কারণ চিত্তের প্রচ্ছন্ন কাম-সংস্কার। কামুক চিত্ত জরায়ু (Uterus), ডিম্বাধারদ্বয় (Ovaries), সুপ্রারেনাল কর্টেক্স (Suprarenal Cortex), থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড (Thyroid Gland) প্রভৃতি প্রবণস্ব ভাব শারীরিক যন্ত্রপাতির উপরে এমন ক্রিয়া বিস্তার করিয়া থাকে, যাহাতে উক্ত গ্রন্থিগুলির স্বাভাবিক রসনিঃসারণ-ক্ষমতার বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে,—ফলে রোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। অমৈথুন রোগের উৎপাদক নহে,—দূষিত চিন্তারাশিই রোগের প্রকৃত উৎপাদক। দাম্পত্য-ব্রহ্মচর্য্য-প্রয়াসী

মৈথুন-বর্জ্জনে রোগাশঙ্কা

যুবক-যুবতীরা অল্প চেষ্টা করিলেই চিত্তের দূষণীয় প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিতে পারেন এবং কার্য্যকালাভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশ পাইলে প্রচ্ছন্ন ভোগ-সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারেন। প্রচ্ছন্ন ভোগ-সংস্কারকে উন্মূলিত করিবার অধ্যাত্মিক পন্থা পাশ্চাত্য রতিশাস্ত্রজ্ঞ মনীষীদের নিকটে আজও সম্যক্ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়াই ভিয়েনার ডাক্তার ফ্রয়েড্ প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কেবল যৌন-স্ফূর্ত্তিই দেখিয়াছেন। নিজকরধৃত অমূল্য সম্পদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্দিহান রহিয়াছি বলিয়াই প্রচ্ছন্ন ভোগ-কামনাকে প্রকাশ্য ভোগাচারের দ্বারা প্রশমিত করিবার নির্ব্বোধযোগ্য কুযুক্তির আমরা আশ্রয় লইতে চাহি। ভারতের আর্য্য-ঋষির জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে নব-বিজ্ঞানোজ্জ্বলা সভ্যতার সম্পূর্ণ নাগালের বাহিরে দাম্পত্য চিত্ত-বৃত্তিকে পরিশোধিত এবং সর্ব্বপ্রকার কামজ রোগের সম্ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে সমর্থ অব্যর্থ যৌগিক প্রণালীসমূহ এই মহাদুর্দ্দিনেও অটুটভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। সুতরাং রোগাতঙ্কে বিভীষিকাগ্রস্থ হইয়া পাশ্চাত্যের পানে বিহ্বলনেত্রে তাকাইবার কোনও প্রয়োজন ভারতবর্ষের আদৌ নাই। ভারতের পুত্রকন্যা একবার নিজ-জননীর স্নেহাঞ্চলে সঙ্গোপনে-রক্ষিত সযত্নে-লুক্কায়িত অমূল্য নিধির অন্বেষণে ব্যাকুল হও,—যাহা তোমার ছিল, তাহা পুনরায় তোমার হইবে।

হারিয়ে গিয়েছে যাহা
বিস্মৃতির বালুকা-প্রান্তরে,
খোঁজ,—তাহা পাবে ফিরে
ধ্যান মৌন আপন অন্তরে।



সন্তান-জনন *

আমাদের পরমযোগী পূর্ব্বপুরুষেরা মানবের জন্মকে এবং সহজাত সংস্কারসমূহকে সম্যক্ শুদ্ধতার সম্ভাবনায় মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই কল্পনাকে সফল সত্যে পরিণত করিবার জন্য শত সহস্র পরীক্ষায় (experiments) ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই সকল পরীক্ষার ফলাফল কালক্রমে কামশাস্ত্র নামক একটী পৃথক্ বিদ্যায় পরিণত হইয়াছিল। স্থূলেন্দ্রিয়াদির সাহায্য-নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধচেতা যোগীরা ধ্যানের বলেও বহু অজ্ঞানিত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং শিষ্যানুশিষ্যক্রমে তাহার অভ্রান্ততার প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া সেই সকল সিদ্ধান্তকে কামবিদ্যার অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যা অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্র কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুপ্তাচারে রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করি। আশাও করি যে, যেদিন গার্হস্থ্য জীবন একটা গোঁজামিলের জীবন না হইয়া প্রকৃত তপস্যার জীবন হইবে, সেইদিন গার্হস্থ্যাশ্রমী নরনারী নিজেদের সাধনা-সমুজ্জ্বলা প্রতিভার বলে সকল তত্ত্ব অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এই বিষয়ে একটু ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাইব।

সুপ্রাচীন কামশাস্ত্র ও তাহার পুনরুদ্ধার-সম্ভাবনা

এমন অমোঘ বীর্য্যেই শ্রেষ্ঠ সন্তান সমুৎপাদিত হয়, যাহা দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ, যাহা অতিশয় প্রগাঢ়, যাহা সজীব এবং যাহার উপরে মনের সাত্ত্বিকী ক্রিয়াশীলতার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। যে দৈহিক মিলন অল্পকালস্থায়ী এবং একান্তই কামবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত, তাহাতে দেহের

---

* সন্তান-জনন সম্পর্কে গৃহী সঙ্গমেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিবার অধিকারী বলিয়া গ্রন্থকার নিজেকে মনে করেন না। এই সম্পর্কে গৃহীরাই নিজ পথ নির্ণয় করিবেন।

শ্রেষ্ঠ শুক্রাংশ ক্ষরিত হয় না, শুধু সেই অংশটুকুই ক্ষরিত হইয়া যায়, যাহা কামাদি চিন্তাদ্বারা কতকটা ক্ষয়োন্মুখ পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সহজে-ক্ষয়প্রবণ, স্বল্পবীর্য্য শুক্র অধিকাংশ সময়েই সন্তান-উৎপাদনে সমর্থ হয় না, হইলেও তাহাতে নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও দুর্ম্মেধা সন্তানই জন্মিয়া থাকে। যাহা প্রাক্তন কামচিন্তার দ্বারা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া রহে নাই এবং যাহা সামান্য উত্তেজনায় ক্ষরিত হইবার জিনিষ নহে, তেমন বস্তুকে * গর্ভে স্থাপন করিতে না পারিলে শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভের আশা বাতুলতা মাত্র। বিভিন্ন সাধন-সম্প্রদায়ের গুপ্ত মত আলোচনায় মনে হয় যে, সম্ভবতঃ এই জন্য আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা নিম্নলিখিত কয়েকটী অথবা ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও উপায় অবলম্বন করিতেন।

কিরূপ বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদিত হয়

(১) মনকে দেহাতীত সত্তায় অথবা দেহের ঊর্দ্ধাংশে স্থির করিতেন।

(২) বিশিষ্টায়াম নামক প্রাণায়াম অবলম্বন পূর্ব্বক শ্বাসের চাঞ্চল্য প্রশমিত করিতেন।

(৩) যোনিমুদ্রা দ্বারা ক্ষয়োন্মুখ বীর্য্যের বহির্ম্মুখিনী গতি সাময়িক ভাবে স্তব্ধ করিয়া দিতেন।

মনে হয়, তাঁহাদের অবলম্বিত জনন-প্রণালী যুক্তিসঙ্গত এবং বিজ্ঞান-সম্মত। বীর্য্যক্ষরণের শারীর কারণ দৈহিক প্রক্রিয়া, মানসিক কারণ কামাতুরতা। এই দুই কারণের যে কোনও একটীকে অবলম্বন করিয়া বীর্য্যধাতু ক্ষরিত হইতে পারে। কিন্তু, দুইটী কারণই একত্র মিলিত হইলে অতি দ্রুত শুক্র-নির্গম হইয়া যায়। পরন্তু, একটী কারণকে

* চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে একমত যে, Prostatic Juice ক্ষরণে সন্তান-জনন হয় না, Seminal Secretion প্রয়োজন।

স্বীকার করিয়া অন্য কারণটীকে যদি চেষ্টা দ্বারা নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহা হইলে শুক্রনির্গম বিলম্বে হয় এবং তাহার ফল শুভ হয়। কিন্তু সন্তান-জনন-ব্যাপারে দৈহিক প্রক্রিয়ার নির্ব্বাসন অসম্ভব। অপিচ, কামবুদ্ধির নির্ব্বাসন সাধক-সাধিকার পক্ষে অসম্ভব নহে। মনকে দেহাতীত তত্ত্বে অথবা দেহের ঊর্দ্ধাংশে স্থির করিয়া প্রাণায়াম-সাহায্যে মৈথুনকালীন কামভাব অগ্রসর সাধক-সাধিকারা অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারেন।

শুক্র-নির্গমে বিলম্ব ঘটাইবার উপায়

মন যখন দেহের যে যন্ত্রে থাকে, তখন সে যন্ত্র সামান্য শ্রমে ক্লান্ত হয়। লেখা-পড়ার সময়ে পুস্তকের দিকে মন না রাখিয়া চক্ষু বা মস্তিষ্কের দিকে মন রাখিলে চক্ষু বা মস্তিষ্ক সহজে ক্লান্ত হয়। প্রাণায়াম কালে ভ্রূমধ্যে মন না রাখিয়া ফুস্‌ফুসে রাখিলে সহজে শ্রান্তি আসিয়া পড়ে। ব্যায়ামের সময়ে দেহের মাংসপেশীগুলির দিকে মন দিলে যে অল্প-সময়-মধ্যে ব্যায়াম হইয়া যায়, একথা প্রত্যেক ব্যায়ামাভ্যাসীরই পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। সন্তান-জনন-কালেও মন যদি জনন-যন্ত্রেই অবস্থান করে, তাহা হইলে সামান্য পরিমাণ দৈহিক সঞ্চালনেই জননযন্ত্র তাহার উত্তেজনার চরমে পৌছে এবং অল্প সময়ে শুক্রনির্গমন করিতে বাধ্য হইয়া অবসাদগ্রস্ত হয়। ব্যায়ামকারীর পক্ষে ব্যায়ামকালে মাংসপেশীগুলিতে মন রাখা হিতকর, **কিন্তু সন্তানজননকারীর পক্ষে জনন-কালে জননেন্দ্রিয়ে মন রাখা ক্ষতিকর।** এই সময়ে মন জননযন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিলে জননাঙ্গের স্বাভাবিকী শ্রান্তি আসিতে বিলম্ব হয়, সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে যাহা পরম সহায়ক, যোগিজনা-চরিত সেই ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামাদি-সমন্বিত মানসিক কৌশলসমূহকে

জনন-কালে মন জননাঙ্গে রাখার অপকারিতা

জনন-ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া গৃহী সাধক প্রকৃতই লাভবান্ হন। ইহা কল্পনার বা কুসংস্কারের প্রশ্রয় নহে। জনন-কালে মনকে নামজপ, ইষ্ট-চিন্তা প্রভৃতি যৌগিক কৌশলের সহায়তায় ভগবানের পায়ে ফেলিয়া দিতে পারিলে, জন্মদান কার্য্য কামবর্জ্জিত হইতে পারে।

জননকালে মনকে কোথায় রাখিবে

মনকে যত উৎকৃষ্ট তত্ত্বে রাখা যায়, সন্তানের তত অধিকতর কুশল হয়। "তত্ত্ব" বলিতে অনেক কথা বুঝা যায়। ব্রহ্মও একটী তত্ত্ব, মহাপুরুষের জীবনও একটী তত্ত্ব, জগৎ-কল্যাণও একটী তত্ত্ব, স্বদেশসেবাও একটী তত্ত্ব। সর্ব্বকালীন আচরণে যে-নরনারী যে-তত্ত্বটির অনুশীলন করিয়াছেন, জনন-কালে তাঁহাদের পক্ষে সেই তত্ত্বটীতে মনঃসন্নিবেশন কর্ত্তব্য। তত্ত্বে মনঃসন্নিবেশকালে দেহমধ্যস্থ স্থানবিশেষ ঐ সন্নিবেশনের কেন্দ্রস্বরূপ হইতে পারে, দেহাতিরিক্ত বহির্দ্দেশকেও আশ্রয় করা যাইতে পারে।

অভ্যাসের শক্তি

ইহাও চিরাচরিত অভ্যাস-সাপেক্ষ। কারণ, যিনি প্রতিদিন ভগবদুপাসনাকালে দেহের একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে অথবা বহির্দ্দেশস্থ একটী নির্দ্দিষ্ট আলম্বনে মন স্থির করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, জননকালে তাঁহার পক্ষে হঠাৎ কেন্দ্র বা আলম্বন পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় বিফলতা আসিবেই। পরন্তু, জীবনব্যাপী চেষ্টায় যে ভাগ্যবান দম্পতী একটি তত্ত্বকে ধরিয়া একটী কেন্দ্রকে লইয়া ভগবদুপাসনাকালে মনঃসন্নিবেশনের অভ্যাস করিয়াছেন, জননকালে তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। দৃষ্টান্ত যেমন, অভ্যাসবলে নৈপুণ্যলাভ করিলে পূর্ণকুম্ভ শিরে ধারণ করিয়াও নর্ত্তকীরা স্বচ্ছন্দে নৃত্য-গীতাদি করিতে পারেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও কলসী হইতে মন অন্যত্র যায় না। কলসী হইতে মন অন্যদিকে ধাবমান হইলে তৎক্ষণাৎ কলসীর পতন অনিবার্য্য। অথচ, ইহা লইয়াই কঠিন কঠিন রাগরাগিণীর শাস্ত্রসম্মত

আরোহণ অবরোহণ চলিতেছে, কঠিন কঠিন তালে পদসঞ্চালন হইতেছে।

দেহাতীত আলম্বন ও দেহমধ্যস্থ কেন্দ্র

এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দেহাতীত আলম্বন অপেক্ষা দেহমধ্যস্থ কেন্দ্রসমূহই সাধক-সমাজে একটু বেশী আদর পাইয়াছে। দেহাতিরিক্ত বহির্দ্দেশস্থ বস্তুতে বা বিষয়ে ধ্যান জমাইতে তাঁহারা যতটা রুচিসম্পন্ন, এই দেহকেই সর্ব্বদেবতার নিবাস ও সর্ব্বতীর্থের পুণ্যপীঠ জ্ঞান করতঃ নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী এক একটী বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে মনঃস্থির করিবার ধারাবাহিক প্রয়াসে তাঁহারা তার চেয়ে বেশী আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"যাহা নাই ভাণ্ডে
তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।"

পরন্তু,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি
তে সন্তি দেহমন্দিরে।"

শিবসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

মানবদেহই সর্ব্বতীর্থের আকর ও সর্ব্বদেবতার নিবাস ভূমি

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ
সপ্ত-দ্বীপ-সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ
ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্র-পালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে
নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি
বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥

স্থষ্টি-সংহার-কর্ত্তারৌ
ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ
জলং পৃথ্বী তথৈবচ ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি
তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র
ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥”

দেহকেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ইহারই মধ্যে যোগীরা ত্রিজগতের বিভাগ করিয়াছেন। নাভি হইতে তন্নিম্নে তামসিক জগৎ বা পাতাল, নাভির ঊর্দ্ধে ও কণ্ঠের নিম্নে রাজসিক জগৎ বা মর্ত্ত্য এবং কণ্ঠ হইতে তদূর্দ্ধে সাত্ত্বিক জগৎ বা স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিতান্ত তামসিক ভাবাপন্ন সাধকের পক্ষে তাঁহারা যোনিমণ্ডলে (১) বা উপস্থমূলে (২) মনঃস্থৈর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন. তমোরাজসিকের পক্ষে নাভিমূল (৩) রাজসিকের পক্ষে হৃৎপদ্ম (৪) রজঃসাত্ত্বিকের পক্ষে

---

(১) উপস্থ ও গুহ্যদ্বার এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুকে যৌগিক পরিভাষায় যোনিমণ্ডল বলে। ষট্‌চক্রভেদীরা এই স্থানেই মূলাধার নামক চক্রের কল্পনা করিয়া থাকেন স্ত্রীলোকের পক্ষে কামাদ্রি (Clitoris) হইতে গুহ্যপর্য্যন্ত সবটুকুই যোনিমণ্ডল

(২) পুরুষের উপস্থমূল কামগ্রন্থি (Prostate Gland) আর স্ত্রীলোকের উপস্থমূল জরায়ু (Uterus)। ষট্‌চক্রভেদীরা উপস্থমূলেই স্বাধিষ্ঠান নামক চক্রের কল্পনা করিয়া থাকেন।

(৩) এই স্থানেই মণিপুর নামক চক্র কল্পিত হইয়া থাকে।

(৪) হৃৎপদ্ম বলিতে স্নায়ু, রক্ত, মাংসাদির বিচার করিতে গেলে হৃৎপিণ্ড (Heart) বুঝায়, কিন্তু যোগীর হৃদয় তাহা নহে। অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি সুখকরী

কণ্ঠমূল (৫) এবং সাত্ত্বিকের পক্ষে ভ্রূমধ্য (৬) ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

জননকালে স্বামিপত্নীর মন জননযন্ত্রে থাকিলে সন্তান কামুক, বক্ষে থাকিলে সাহসী এবং অহঙ্কারী, ভ্রূমধ্যে থাকিলে ব্রহ্মবাদী ও সর্ব্বকল্যাণকৃৎ হয়। একের মন নিম্নগামী ও অপরের মন উচ্চগামী হইলে, যাহার মনোগতি অধিকতর প্রবল, সন্তান তাহারই মানসিক সাদৃশ্য অধিক পায়, কিন্তু অপরের মনোগতির প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না।

জননকালে মনঃসন্নিবেশনের ফলাফল

নিম্নগামিনী মনোগতিকে ঊর্দ্ধগামিনী করিতে প্রাণায়ামের শক্তি অসাধারণ। প্রাণায়াম প্রধানতঃ শরীরের ঊর্দ্ধাংশের ও মধ্যাংশের

বৃত্তির উদয় হইলে বক্ষের অভ্যন্তরে যে-প্রদেশে সুখময় বোধ হয় এবং দুঃখ ভয়, ক্রোধ, বিরাগাদি উপস্থিত হইলে বিষাদময় বা ক্লিষ্ট বোধ হয়, সেই প্রদেশেরই যৌগিক নাম হৃদয়। ষটচক্রভেদীরা এই স্থানেই 'অনাহতপদ্মের' কল্পনা করিয়া থাকেন। বিনা আঘাতে স্বাভাবিক ভাবে এখানে মহানাম শ্রুত হয় বলিয়া ইহার নাম অনাহত পদ্ম।

(৫) এই স্থানেই যোগীরা বিশুদ্ধ নামক চক্রের কল্পনা করিয়াছেন। রাজসিকতার গণ্ডী ছাড়াইয়া আসিয়া সাত্ত্বিকতার বিশুদ্ধতার পরম প্রভাব এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইল বলিয়াই ইহার নাম বিশুদ্ধ।

(৬) ভ্রূমধ্য বহুনামে পরিচিত। যথা,—নাসাগ্র, তৃতীয় নয়ন, ত্রিবেণীসঙ্গম, দ্বিদলপদ্ম, আজ্ঞাচক্র ইত্যাদি। গীতায় নাসাগ্রে মনস্থির করিবার উপদেশ আছে,—যথা,—"সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং।" সাধারণতঃ নাসিকাগ্র বলিতে লোকে যাহা বুঝে, সেখানে দৃষ্টি স্থির করিতে গেলে শিরোরোগ অবশ্যম্ভাবী। নিম্নদিক্ হইতে বলিলে ভ্রূমধ্যই নাসাগ্র হয়,—যোগীরা ইহাই বোঝেন। গীতা আরও বলেন,—"ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্" ইত্যাদি। মহাদেব ভ্রূমধ্যে মনঃস্থির করিয়াই জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই মদনভস্ম উপাখ্যানে রূপকে বলা হইয়াছে। ভ্রূমধ্যই ব্রহ্মজ্ঞের তৃতীয় নয়ন বা দিব্যচক্ষু। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী

ক্রিয়া। তাই প্রাণায়ামকালে মন বাধ্য হইয়াই দেহের নিম্নাংশকে ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখী হয় এবং তাহারই ফলে বীর্য্যক্ষয়ের প্রবণতা হ্রাস পায়। আবার শ্বাসের চাঞ্চল্য নাশ প্রাপ্ত হইলে মনেরও চাঞ্চল্য নাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই কারণেও বীর্য্যের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। "হঠযোগ প্রদীপিকা" বলিয়াছেন,—

প্রাণায়ামের সার্থকতা

"চলে বাতে চলং চিত্তং
নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।"

শক্তিস্রোত এইস্থানে আসিয়া মিলিত হয়, তাহাই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর রূপকে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত ত্রিবেণী এলাহাবাদে নয়, যার যার ভ্রূমধ্যেই ত্রিবেণী বিরাজ করে। শাস্ত্রে আছে,— "ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী। ঈড়া-পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী ॥ ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" আরও আছে,—"ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ। আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষ বরাননে ॥" প্রকৃত সাধক এলাহাবাদের ত্রিবেণীতে অনাদর করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ ত্রিবেণীতেই সমাদর প্রদর্শন করেন। ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশ করিলে যে অপূর্ব্ব রূপ নিবিষ্ট সাধকের দর্শনে আসে, দ্বিদল কথাটী তাহারই ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সৃষ্ট। রামায়ৎ বলেন রামসীতাকে একত্র দেখিলাম, শাক্ত বলেন শিবদুর্গাকে দেখিলাম, বৈষ্ণব বলেন রাধাকৃষ্ণকে দেখিলাম, বৈদান্তিক বলেন জীব ও ব্রহ্মকে দেখিলাম, সাংখ্যযোগী বলেন, প্রকৃতি-পুরুষকে দেখিলাম,—। সকলেই অভেদ দর্শন করেন অথচ দ্বিত্বের আভাসও অনুভব করেন। উক্ত রূপ কোনও চিত্রপটে আঁকা নহে, উহা অবর্ণনীয় এবং অকল্পনীয়। এইস্থানে মনোলয়ের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ নয় বলিয়া ইঁহার নাম আজ্ঞাচক্র দাস্য-ভাবের সাধকেরা বলেন,—'এখানে প্রভুর আজ্ঞা শুনিতে পাই।' সোহংভাবের সাধকেরা বলেন,—'এখানে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করি।'

৫—"বায়ু চঞ্চল হইলে চিত্ত চঞ্চল হয়, আবার বায়ু স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়।" বীর্য্যক্ষয় এবং ক্ষয়াবরোধের সহিত মানসিক চঞ্চলতাও চাঞ্চল্যনিরোধের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাণবায়ু, মন এবং বীর্য্য, এই তিনটীই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলে, একে অপরের গতি বা স্থিতির অনুকরণ করে। যাহার প্রাণবায়ু চঞ্চল, তাহার মন চঞ্চল হইবেই, বীর্য্য ক্ষয়প্রবণ হইবেই। যাহার মন অস্থির, তাহার বীর্য্য ক্ষয়প্রবণ হইবেই, প্রাণবায়ু চঞ্চল হইবেই। আবার, যাহার বীর্য্য ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার মন ও প্রাণবায়ু চঞ্চল না হইয়াই পারিবে না। এই তত্ত্বটী যোগীরা যেদিন আবিষ্কার করিলেন, সেইদিন হইতেই আধ্যাত্মিক সাধনরাজ্যের যেন শত শত রুদ্ধ দুয়ারের কবাট যুগপৎ খুলিয়া গেল। নানা সম্প্রদায় নানা উপায় প্রয়োগে কেহ বা বীর্য্যের স্থিরতা, কেহ বা মনের স্থিরতা, কেহ বা প্রাণের স্থিরতার সাধন করিয়া পরমার্থসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। কদাচিৎ দুই একটী গভীর প্রতিভার অধিকারী তিনটিরই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিলেন।

প্রাণবায়ু, মন ও শুক্রের পরস্পর সম্বন্ধ

যাহারা প্রাণের স্থিরতা সাধন করিয়া তদবলম্বনে পরমকল্যাণ লাভে যত্নবান্ হইলেন, প্রাণায়ামের অধিকাংশ কৌশল তাঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা মনের স্থিরতা দ্বারা পরমকল্যাণ লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, প্রাণায়ামের কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কৌশল স্বভাবতই তাঁহাদের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। ফলে ধীরে ধীরে প্রাণায়াম-সাধনার পরস্পর-বিরোধী দুইটি পৃথক শ্রেণী দাঁড়াইয়া গেল। এক শ্রেণীর সাধকেরা প্রাণবায়ুর উপরে নিজেদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া তাহাকে যথেচ্ছা পরিচালন ও বিধারণ করিতে লাগিলেন, অপর শ্রেণীর সাধকেরা প্রাণ-

প্রাণায়াম-পদ্ধতিসমূহের আবিষ্কার

বায়ুর উপর হইতে ইচ্ছা-শক্তিকে গুটাইয়া আনিয়া শুধু ফলাভিসন্ধিহীন নিস্পৃহ মনকে তাহার উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই দুই শ্রেণীর সাধকেরা প্রণায়াম কথাটীকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। উভয়েই বলিলেন,—"**শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম**" (পাতঞ্জল দর্শন), কিন্তু "গতিবিচ্ছেদ বলিতে তাহারা দুই প্রকার বুঝিলেন। এক শ্রেণীর সাধকেরা বলিলেন,—"গতিবিচ্ছেদ কথাটার মানে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তদুভয়কে নিয়মবিশেষের অধীন করা"। **অপর শ্রেণীর সাধকেরা বলিলেন,—"গতিবিচ্ছেদ কথাটা বলিতে, শ্বাস গ্রহণের পরে প্রশ্বাস না পড়িলে এবং প্রশ্বাস ত্যাগের পরে শ্বাস না গৃহীত হইলে প্রাণবায়ুর যে স্বাভাবিক স্থিতি হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে"** ফলে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর মতে কুম্ভক শব্দের অর্থ 'বলপূর্ব্বক বায়ুধারণ'। **দ্বিতীয় শ্রেণীর মতে কুম্ভক শব্দের অর্থ "বিনা প্রযত্নে, বিনা চেষ্টায়, বিনা অবরোধে, স্বাভাবিক কৌশলে প্রাণবায়ুর স্থিরতা সম্পাদন।"** কেহ কেহ বা উভয় মতেরই আবার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন এবং স্থলবিশেষে প্রথমোক্ত মতকে এবং অপর স্থলে দ্বিতীয়োক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়া উভয় প্রণালীর সংমিশ্রণে বৈচিত্র্যময় প্রাণায়াম-পন্থা প্রচলিত করিলেন।

প্রাণায়ামের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা

কুম্ভকের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা

প্রাণায়াম কথাটা লইয়া এইরূপ বহুমত থাকার দরুণে প্রাণায়ামের ইষ্টানিষ্টতা সম্বন্ধে সাধারণের মনে বহু প্রকার ধারণাই আছে। কিন্তু

প্রাণায়ামের ইষ্টানিষ্টতা

প্রাণায়ামের শত সহস্র প্রণালীর মধ্যে একটী যখন আর একটীর মতন নহে, তখন প্রাণায়ামের উপকারিতা বা বিপজ্জনকতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোনও নির্দ্দিষ্ট মত পোষণ করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। প্রাণায়ামের এমন অনেক প্রণালী আছে, সামান্য অনিয়ম হইলে যাহা দ্বারা উন্মাদ, হাঁপানি, উরঃক্ষত, যক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন রোগ জন্মিতে পারে। এমন অনেক প্রণালীও আছে, যাহাতে সামান্য অনিয়মে ক্ষতি হয় না, কিন্তু বেশী অনিয়ম হইলে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আবার এমন প্রণালীও আছে, যাহাতে অনিয়ম যতই হউক না কেন, প্রাণায়ামহীন ব্যক্তি ঐ অনিয়ম করিলে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইত, প্রাণায়ামকারী ঠিক ততটুকুই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, প্রাণায়াম অভ্যাসের দরুণ নূতন কোনও ক্ষতি হইবে না। এমন প্রাণায়াম আছে, যাহা অভ্যাসে দারুণ ক্লেশ, প্রতিক্রিয়ারও আশঙ্কা প্রচুর, অথচ সুফল কম। এমন প্রাণায়াম আছে, যাহা অভ্যাসে দারুন ক্লেশ থাকিলেও প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা কম এবং সুফলও কম। এমন প্রাণায়াম আছে, যাহাতে দারুন ক্লেশ থাকিলেও এবং প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা প্রবল হইলেও, সুফল অবর্ণনীয়। এমন প্রাণায়ামও আছে, যাহাতে ক্লেশ যথেষ্ট, প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা তিলমাত্র নাই, কিন্তু সুফল নগণ্য। এমন প্রাণায়াম প্রণালী আছে, যাহাতে প্রতিক্রিয়া কম, সুফল কম এবং ক্লেশ কম; এমন প্রাণায়াম-প্রণালীও আছে, যাহাতে প্রতিক্রিয়ার ভয় নাই, ক্লেশ নাই, অথচ সুফল অবর্ণনীয়। **মোট কথা, প্রাণায়াম মাত্রেই হিতকারী বা অহিতকারী নহে,**

বিভিন্ন প্রণালীর প্রাণায়ামের কৌশল এবং ফল বিভিন্ন।

উদ্দেশ্য অনুসারে প্রাণায়াম প্রণালীর বিভিন্নতা অনিবার্য্য

সাধনের উদ্দেশ্য এবং সাধক-জীবনের অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রাণায়াম প্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। যে ব্যক্তি দেহকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে চাহে, আর যে ব্যক্তি আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করিতে চাহে, তাহাদের উভয়ের প্রাণায়াম প্রণালী এক হইতে পারে না। প্রথম সাধকের এবং অগ্রসর-সাধকের প্রাণায়াম প্রণালীও সকল সময়ে একরূপ নহে। অনুভূতির রাজ্যে যে যত সূক্ষ্ম সম্পদ কুড়াইতে পারিতেছে, তাহার প্রাণায়াম-প্রণালী তত সূক্ষ্ম হইবে। সন্তান-জননকালে দেহের আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বলসিদ্ধ কুম্ভকযুক্ত প্রাণায়াম এতদবস্থায় অতি দুঃসাধ্য এবং কোনও কোনও স্থলে বিপজ্জনক। আবার, আন্দোলনশীল দেহের প্রাণবায়ুর দ্রুততা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এস্থলে তাহার উপর আংশিক বল এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগও আবশ্যক। অধিকন্তু, কামচর্চ্চার কালে একমাত্র প্রাণায়ামই মনকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন রাখিতে সম্যক্ সমর্থ নহে।

জননকালে বিশিষ্টায়াম নামক প্রাণায়াম

এইজন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা চেষ্টাকৃত-কুম্ভকবর্জ্জিত ধীরমন্থর-শ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত বিশিষ্ট-প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টনামের সাধনা করিতেন এবং দৈহিক সঞ্চালনকে উপভোগাগ্রহের অনুগত না রাখিয়া প্রাণায়ামের অনুকূল এবং মন্ত্রাক্ষরের সম্যক্ অনুগত রাখিতেন।

নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বে মনঃসন্নিবেশন একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার। প্রাণায়াম তাহার তুলনায় স্থূলতর। যোনিমুদ্রা প্রথমাভ্যাস-কালে ততোধিক স্থূল। তবে,

পরস্পর পরস্পরের সহযোগে ক্রমশঃ স্থূলতাবর্জ্জিত হইয়া সূক্ষ্মত্ব লাভ করে গুহ্যদ্বারকে দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই

যোনিমুদ্রা

স্থানে মনঃসন্নিবেশ করিলে সাধন-সঞ্জাত সূক্ষ্ম শ্রুতি-শক্তির বলে যে গভীর ওঙ্কার-ধ্বনি গুহ্যমূল হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত মেরুবংশের মধ্য দিয়া অবিরাম স্রোতে শ্রুত হয়, তাহা শ্রবণের চেষ্টার নামই যোনিমুদ্রা। **যোনিমুদ্রার দ্বারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই নিরতিশয় উদ্দাম লৈঙ্গিক উত্তেজনা আশ্চর্য্যরূপে সামান্য সময়মধ্যে প্রশমিত হইয়া যায়। জননাঙ্গে তুষার-গলান শীতল জল ঢালিয়াও যে ফল পাওয়া যায় না, সামান্য সময় যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত অভ্রান্ত অকাট্য সিদ্ধান্ত।**

এই জন্যই গৃহস্থ যোগীরা নির্দ্দিষ্ট কয়েকবার দৈহিক সঞ্চালনের পরে অথবা অত্যধিক অনুভূতি-শীলতার মুহূর্ত্তে দেহচেষ্টা নিবৃত্ত করিয়া যোনিমুদ্রাযোগে অধঃপাতিত চেতনাশক্তিকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া ভ্রূমধ্যে সংস্থাপিত করিতেন। এইভাবে স্বকীয় সামর্থ্যের অনুযায়ী যতবার সম্ভব ক্ষয়াবরোধ করিতে যত্নবান্ থাকিয়া দেহচেষ্টার যাবতীয় ফলাফল সম্যক্ শ্রীভগবানের হস্তে সমর্পণ করিতেন।* পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসমূহে তাঁহারা ভোগবুদ্ধি বর্জ্জন করিতেন এবং নিজদিগকে পরম-দেবতার প্রতিনিধি জানিয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভোগের চর্চ্চাকে ত্যাগের গরিমায় মহান্ ও নিষ্কামতার সুষমায় সুন্দর করিতে চেষ্টিত থাকিতেন।

যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একথা স্বীকার করিতেন যে, **সন্তানজনন ব্যাপারটা পুরুষকারের আয়ত্ত।** বর্ত্তমান দম্পতীগণকে আমরা এই

সন্তান-জনন ব্যাপারটাকে পুরুষকারের আয়ত্ত বলিয়াই গণনা করিতে হইবে

কথাটুকু মনে করাইয়া দিতে চাহি যে, পুত্রকন্যার জনন সম্বন্ধে তাহাদিগকে আজ সচেতন হইতে হইবে এবং **সন্তানের জন্মকে দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া মনে না করিয়া পুরুষকারের আয়ত্ত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে হইবে।** যে সকল স্বামিপত্নী সন্তানের জন্মের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে নবাগতের আবির্ভাব ব্যাপারটী দৈবাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু **যাহারা সবই জানে সবই বুঝে, তাহাদের সন্তান-জননকে দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিব কেন?** দুর্ভাগ্যবশতঃ আজিকার যুগে বিবাহের বহু পূর্ব্বেই বালক ও বালিকারা অপরিণামদর্শীর অপবিত্র মুখ হইতে বিবাহিত

---

* রমণির-সান্নিধ্যে পুরুষের ও পুরুষ-সান্নিধ্যে রমণীর মন হইতে যাবতীয় উত্তেজনা ও বিকার প্রশমিত করিবার জন্যই যোনিমুদ্রার আবিষ্কার। এই হিসাবেই যোনিমুদ্রা কুমার, কুমারী, সংযমী গৃহী ও গৃহিণীর ভিতরে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু রমণ-কালীন যোনিমুদ্রার ব্যবহার যে কিরূপ ফলপ্রদ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকারের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত প্রদান অসম্ভব ব্যাপার। সন্তান-জনন সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়টুকু লইয়া বিভিন্ন গৃহস্থযোগী ব্যক্তির বিভিন্ন মত জানা গিয়াছে। সুতরাং দশটী পংক্তিযুক্ত এই অনুচ্ছেদটুকু মাত্র পাঠকের অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে ইন্ধন দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে।

জীবনের গূঢ়তম বিষয়গুলির সবিস্তার ব্যাখ্যা শুনিয়া জন্ম-রহস্যের যবনিকা দূরে সরাইয়া দিতে পারিতেছে। যাহা প্রাকৃতিক প্রহেলিকা, তাহা আর তাহাদের নিকট প্রহেলিকা নহে এবং গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, তরলভাবে কথিত, শ্রুত ও আলোচিত হওয়ার ফলে জগতের গভীরতম একটী তত্ত্ব সকল গুরুত্বে বঞ্চিত ও গাম্ভীর্য্যে রিক্ত হইয়া রশ্মিমুক্ত অবাধ উদ্দাম গতিতে কামের পথে চলিবার জন্য মানুষের বাতগ্রস্ত চরণদ্বয়কেও নিয়ত প্রোৎসাহিত করিতেছে।

সম্ভোগ যখন তোমরাই কর তখন সন্তান-জন্মের দায়িত্ব বিধাতার ঘাড়ে চাপাইও না।

ইহাই যখন অবস্থা, তখন সন্তানের আবির্ভাবের কারণকে অতি-বার্দ্ধক্য-কাতর জরাজীর্ণ বিধাতাপুরুষের উপেক্ষাশীর্ণ দুর্ব্বল স্কন্ধের উপরে ন্যস্ত না করিয়া বিবাহিতদিগকে নিজেদের স্কন্ধেই লইতে হইবে। জীবনের সকল অংশ হইতেই যদি ভগবানকে মনে প্রাণে নির্ব্বাসিত করিয়া থাক, তবে আজ সন্তানের জন্মের দায়কে চির-উপেক্ষিত, চির-অনাদৃত ভগবানের ঘাড়ের উপরে তুলিতে যাইও না। আজ তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সন্তানের আবির্ভাবের মূলে তোমার পুরুষকারই দায়ী এবং পুরুষকার প্রয়োগের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার উপরে সন্তানের জন্মের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নির্ভর করে।

ইহা বুঝিয়া দীর্ঘ-প্রযত্নে অপরিসীম উৎসাহ সহকারে বিবাহিত নারী ও পুরুষকে এমন বিশুদ্ধ চিন্তার, বিশুদ্ধ বাক্যের এবং বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে, যেন সন্তানজনন-মুহূর্ত্তে তাহাদের দেহ প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলেও হৃদয়টী অনাসক্ত প্রেমে, মনটী সন্তানের দিব্য স্বরূপে এবং আত্মা আত্মস্থতায় অবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় লগ্ন রহিতে পারে। দুই একদিন সংযমের সাধনা করিয়া কাহারও সেইরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ হইতে পারে না, অথবা ঢাছাঢিলা চেষ্টায় সাফল্য সঞ্চয়ের আশা করা যাইতে পারে না। চেষ্টাটী কঠোর হওয়া চাই এবং চেষ্টাপথে প্রাক্তন-কর্ম্ম-সংস্কারহেতু দুই একবার পদস্খলন হইলেও হতাশ বা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী না হইয়া গভীর-তর উৎসাহে পুনরায় অগ্রসর হওয়া চাই। দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের পরিমাণ বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, যাহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে একবার প্রবেশ করিয়াছে, কাপুরুষের ন্যায় পলায়নপর না হইয়া সকল সীমাবদ্ধতা ও জটিলতার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে নিজ নিজ জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে বিকশিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতে হইবে এবং সন্তানসন্ততির জন্মকে নিজ নিজ সাধনার দ্বারা কল্যাণাবহ করিয়া তুলিতে হইবে। হইতে পারে, উন্নতিলিপ্সু স্বামীর পক্ষে উপযুক্তা স্ত্রী এবং উন্নতিপ্রার্থিনী স্ত্রীর পক্ষে উপযুক্ত স্বামী লাভ হয় নাই, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র নিরাশ না হইয়া তপঃসাধনার বলে সকল বাধাবিঘ্নকে

জননকালে দেহ প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলেও মনকে দিব্য চেতনায় ডুবাইতে হইবে

গৃহীত গার্হস্থ্যকে কাপুরুষের ন্যায় ত্যাগ অনুচিত

পারস্পরিক অযোগ্যতাকে তপস্যার বলে দূর করিতে হইবে।

পদবিদলিত ও চূর্ণীকৃত করিতে হইবে। যে মানুষ বিবাহিত জীবনটাকে একটা ইতর সুখের ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভগবৎ-সাধনার শক্তিতে আজ তাহাকে কামগন্ধহীনভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত চেষ্টায় শুদ্ধ মানুষের জন্মদান করিতে হইবে। এ যোগ্যতা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অসংখ্য জনের ছিল, এ যোগ্যতা লাভ করা আজিকার গৃহীর পক্ষেও একান্ত অসাধ্য নহে। ভগবন্নিষ্ঠা সকল অসাধ্য সাধন করে, ভগবন্নিষ্ঠাই সন্তানজননকে কামের ক্লেদ-দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত করিবে। বিবাহিত ভারত আজ জাগ্রত হউক, সকল আত্মঅবিশ্বাস ও সান্দিগ্ধতায় জলাঞ্জলি দিয়া সাধন-সমরে বীরবিক্রমে অবতীর্ণ হউক, নিজেদের দেবভাবকে জীবসুলভ পশুপ্রবৃত্তির উপরে কর্ত্তৃত্ববান্ হইতে সামর্থ্য দান করুক।

আদর্শ দম্পতীর কি কি আবশ্যক

জীবন-সাধনার সিদ্ধিপথে আদর্শ দম্পতীর অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা একান্ত আবশ্যকীয়। যথা,—

(ক) পরস্পরের অনুরাগ ও সহানুভূতি।

(খ) উভয়ের বয়সের নৈকট্য।

(গ) তুল্যবংশীয়তা।

(ঘ) রুচিসাম্য।

(ঙ) এক প্রকৃতিকতা।

(চ) উভয়ের একলক্ষ্যতা।

(ছ) উভয়ের এক সাধন-ধর্ম্ম।

(জ) একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা।

(ঝ) একের স্বাধীনতার প্রতি অপরের সম্মানবোধ।

(ঞ) আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য।

এই সকল অনুকূল অবস্থার সবগুলি না জুটিলেও, কতকগুলি জুটিলেই বিবাহিত নরনারীর জীবনে যথার্থ সুখ লভ্য হইতে পারে এবং তাহাদের জীবন দ্বারা দেশ, সমাজ ও জগৎ উপকৃত হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) স্বামিপত্নীর গভীর অনুরাগের অভাব হইলে তাহাদের সন্তানের মনের ও মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে বহু স্বতোবিরোধিতা সৃষ্ট

হয়। বিশেষতঃ দম্পতীর গৃহি-জীবনও সুখের হয় না। এই জন্যই, যাহাতে উভয়ের শত দোষত্রুটী থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে সুগভীর প্রীতির ও একের জন্য অপরের সহানুভূতির অল্পতা না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য উভয়কেই প্রযত্নশীল থাকিতে হইবে। স্বামী যে পত্নীর এবং পত্নী যে স্বামীর একান্ত আপন, এই কথাটী দেহের বুদ্ধিতে না বুঝিয়া আত্মার দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে এবং একের জন্য অপরকে স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহাই যথার্থ অনুরাগ সৃষ্টির মূল। সহানুভূতির অভাবই সংসারের সকল কলহ ও অশান্তিকে জন্মদান করে এবং একের আত্মার প্রতি অপরের মমত্ববোধের অভাবই সহানুভূতিহীনতা সৃষ্টি করে। স্বামী বা পত্নী যদি পত্নী বা স্বামীর দেহটাকেই নিজের আপন-জন মনে করে এবং দেহের কাছ হইতেই নিজের সকল প্রাপ্য আদায় করিতে চাহে, তাহা হইলেই যথার্থ মমত্ববোধের উন্মেষের ব্যাঘাত জন্মে এবং এই অসত্যের মূলেই অনুরাগহীনতা অঙ্কুরিত হয়। যে-পত্নী স্বামীর দেহপতনের পরেও তাহার আত্মার অমোঘ স্পর্শকে অনুভব করেন, যে-স্বামী পত্নীর পরলোকগমনের পরেও তাঁহাকে নিয়ত হৃদয়-মধ্যে ধারণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ ভালবাসিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিব। অপরের ভালবাসা, পাশব প্রকৃতির মোহাকর্ষণ মাত্র। **যে ভালবাসার শক্তিতে পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি দেহে, মনে ও আত্মায় একনিষ্ঠ থাকেন, যে ভালবাসার প্রেরণার একের মঙ্গলের জন্য অপরে জীবন দিয়াও "কিছুই করিলাম না" বলিয়া আক্ষেপ করেন, আমরা**

পরস্পরের অনুরাগ ও সহানুভূতি ; দেহের বুদ্ধিতে নহে, আত্মার দৃষ্টিতে

যথার্থ ভালবাসা

স্বামিপত্নীর মধ্যে সেই অপার্থিব দিব্য প্রেমের নিত্যবন্ধন দেখিতে চাহি। যে ভালবাসাকে পুরুষ বা নারী সমগ্র জীবনে মনে মনেও একবার অস্বীকার করিতে পারে না এবং যে ভালবাসাকে লাভ করিয়া আর কিছু লাভ করিবার জন্য অন্তরাত্মা আকুল অধীর হয় না, আমরা সেই ভালবাসাকে ভারতীয় দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি।

(খ) স্বামিপত্নীর বয়সের নৈকট্য তাহাদের বন্ধুভাবের বর্দ্ধনের জন্যই আবশ্যক। বয়সের অত্যন্ত পার্থক্য থাকিলে সখ্যভাবের সঞ্চারে অত্যন্ত অধিক বিলম্ব হইয়া যায়, কখনও বা প্রকৃত সখ্যের সৃষ্টিই হয় না। বর্ষীয়ান্ স্বামীর পক্ষে তরুণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ এই কারণেই সমাজ হইতে অপ্রচলিত হইয়া যাওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক স্বামীর পক্ষে অধিকবয়স্কা পত্নী গ্রহণ তেমন ভাবে চল নাই, ইয়োরোপে তাহা অবাধ ভাবেই চলিয়াছে। ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যেই মাত্র এইরূপ বিবাহ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উন্নত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহার প্রচলন কম। তবে, নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে যাহারা বিবাহকে যৌন আকর্ষণের উপরে ভিত্তিমান করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নীর পাণিগ্রহণের দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের বহুল অনুসরণে দেশের যে কল্যাণ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। এদিকে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ আমাদের দেশের একটা জাতীয় কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উভয়ের বয়সের নৈকট্য

তরুণের বৃদ্ধা ভার্য্যা

শুনা যায়, প্রথম-পত্নী-জাত অপোগণ্ড শিশুগুলির অকালমৃত্যু নিবারণের ধর্ম্মবুদ্ধিতেই বর্ষীয়ান্ নরশার্দ্দূল দ্বিতীয়বার একটী দুগ্ধ-পোষ্যা বালিকা-পত্নী সংগ্রহ করেন। সন্তানের প্রতি নিরতিশয় দরদ বশতঃ ইহারা নিজেদের অপরাপর আত্মীয়াদের উপরে পর্য্যন্ত শিশুপালনের ভার দিতে পারেন না, অথচ বিবাহে-ইচ্ছুকা নিঃসন্তানা বিধবা-অনাথার পাণিগ্রহণ করিয়া সৎসাহস বা ন্যায়-বিচারের পরিচয় দিতেও প্রস্তুত নহেন। নারী-জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব এই শ্রেণীর পুরুষদিগের পাণি-গ্রহণেচ্ছাকে নিরঙ্কুশ করিয়া রাখিয়াছে। অপরদিকে স্ত্রী-স্বাধীনতা সত্বেও "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" নানা কারণেই য়ুরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। ফলে, বিবাহিত ও বিবাহিতার বয়ঃ-পার্থক্য দম্পতীর মনোমিলনের একটা বিরাট প্রাকৃতিক বিঘ্নরূপে বিরাজ করিতেছে। তবে, সখ্য-ভাব-সঞ্চারে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ অপেক্ষা তরুণের বৃদ্ধা ভার্য্যা গ্রহণ অধিকতর নিরর্থক ও বিড়ম্বনাপূর্ণ। স্বামীপত্নীর মধ্যে শুধু যে সখ্যভাবই প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অনেকটা গুরু ও শিষ্যার ন্যায়। সাধারণতঃ পুরুষ-প্রকৃতি নারীকে দিয়া নিজের মাধুর্য্যের দিকটা পূর্ণ করিয়া লইতে চাহে। স্বভাবসৃষ্ট এই অন্তঃপ্রেরণাকে তাহার স্বধর্ম্মের অনুসরণে কৃতার্থ হইতে দিবার জন্য স্বামী-পত্নীর মধ্যে বয়সের নৈকট্য থাকিয়াও পত্নীর বয়স স্বামীর বয়সের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক। আমরা নারীর ষোল হইতে আঠার বৎসর বয়সে পুরুষের চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী এবং বিবাহের পূর্ব্বে উভয়েরই প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ও সাধন-সামর্থ্য লাভের অনুরাগী।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা

বয়সের কতটুকু পার্থক্য দরকার?

(গ) স্বামিপত্নীর তুল্যবংশীয়তায় সুফল একমুখে বলিবার নহে। কিন্তু তুল্যবংশীয়তা বলিতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি না যে, নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের পুত্র বা কন্যার সহিত উচ্চপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কন্যা বা পুত্রের মিলনে তুল্যবংশীয়তা রক্ষিত হইল। স্বামী ও পত্নী হয়ত একজাতীয় বা একসমাজভুক্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু যে-যে বংশে উভয়ে জন্মিয়াছেন, সেই বংশদ্বয়ের উৎকর্ষের বিশিষ্টতা একরূপ হওয়া চাই। এই দৃষ্টিতে আমরা অসবর্ণ বিবাহেরও পক্ষপাতী।

তুল্যবংশীয়তা

তবে, সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে, ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন সমাজভুক্ত দুইটী বিভিন্ন বংশের পুরুষানুক্রমিক সাধনা ও তাহার উৎকর্ষ প্রায়ই একরূপ হয় না। এই দৃষ্টিতে আমরা অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধবাদী।

অসবর্ণ বিবাহ

বর্ত্তমান সময়ে একসমাজভুক্ত বিভিন্ন দুইটী বংশের মধ্যেও পুরুষপরম্পরালব্ধ বৈশিষ্ট্যের তুল্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। কারণ, অনেক কাল যাবৎই প্রায় কোনও বংশেই একটী বিশেষ সাধনা নিজের জন্য স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছে না। বিবাহ ও নারীজাতি সম্বন্ধে ব্যক্তিমাত্রেরই ইতর-জনোচিত অতি কুৎসিত মনোভাবই এই দৈন্যের জন্য দায়ী। বর্ত্তমান বিবাহিত যুবক-যুবতীরা নিজ নিজ জীবনের মধ্য দিয়া একটী বিশিষ্ট সাধনাকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া কল্যাণ-প্রভাব-জাত নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়া এই দৈন্যকে দূর করিবার প্রথম সূচনা করিবেন এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ অভিসন্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমসমূহ এই সকল আগামী বালক-বালিকাগণের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা

পুরুষ-পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য-সঞ্চরণের বাধা

দ্বারা বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য-সঞ্চরণের বাধা-সমূহকে নিরাকৃত এবং আনুকূল্যসমূহকে প্রবর্দ্ধিত করিবেন, আমরা এইরূপই আশা পোষণ করিতেছি এবং নিদ্রাযোগে আশার সুখস্বপ্ন দেখিয়াই তুষ্ট না রহিয়া নিজেদের সামান্য শক্তি-সামর্থ্যের সব-টুকুকেই এই আশার চরিতার্থতা সম্পাদনে প্রয়োগ করিতে নিয়ত যত্নবান রহিয়াছি। আমাদের এই চেষ্টা দশ-বিশ বৎসরে সফল হইয়া যাইবে, এমন অসম্ভব কল্পনা আমরা করি না। হয়ত আমাদিগকে দুই-চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে এই একটী মাত্র কর্ম্মধারা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন, কত নব নব সভ্যতার বন্যা আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইবে। কে আমাদিগকে সহায়তা দিল, কে আমাদের বিরুদ্ধতা করিল, তাহাও হয়ত বিচার করিবার অবসর আমাদের মিলিবে না।

(ঘ) দম্পতীর রুচির পার্থক্য সুখাবহ বা কল্যাণকর নহে। কিন্তু রুচির পার্থক্য দূর করা খুব কঠিনও নহে।

রুচিসাম্য

আত্মোন্নতির ইচ্ছা যদি উভয়েরই প্রবল হয় এবং একের প্রতি অন্যের ভালবাসা যদি গভীর হয়, তাহা হইলে একে অন্যের সুরুচিকে অনুকরণ করিয়া এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কুরুচি পরিহার করিয়া

অনায়াসে রুচির সাম্য বিধান করিতে পারেন। যে স্থলে উভয়ের রুচি দূষিত, সে স্থলে উভয়ে উভয়কে আত্মসংশোধনে সহায়তা দিয়া উৎকৃষ্টতর রুচিসম্পন্ন হইতে পারেন। **রুচির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধন-ব্যাপারে উভয়কে নিয়ত প্রকৃষ্টতম জীবনাদর্শের ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে হইবে।** তাহা হইলেই রুচি-সাম্যের দ্বারা জীবনের মূল্য ও মহিমা বর্দ্ধিত হইবে। নতুবা, উভয়ের জীবন-যাপন-প্রণালী যদি কুরুচিদ্বারা প্রণোদিত হইল, তাহা হইলে রুচিসাম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কল্যাণ হইল না। আহারে বিহারে, কথায় বার্ত্তায়, চাল-চলনে উভয়কেই উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা আত্মসংশোধনে যত্নশীল হইতে হইবে।

একপ্রকৃতিকতা

(ঙ) তুল্যবংশীয়তা স্বামিপত্নীর মধ্যে যদিও বা অতি কষ্টে মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু একপ্রকৃতিকতা বাস্তবিকই অতি দুর্লভ। ভিন্ন রুচির স্বামিপত্নীর মধ্যে রুচিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন না হইলেও ভিন্ন প্রকৃতির স্বামিপত্নীর মধ্যে প্রকৃতি-সাম্যের প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার। বরের পিতামাতা এবং কন্যার পিতামাতা একই উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দীর্ঘকাল (অন্ততঃ এক বৎসর কাল নিশ্চিতই) সংযম-সাধনা পূর্ব্বক বর এবং কন্যার জন্মদান করিলে, তেমন বর ও কন্যার প্রকৃতির স্বাভাবিক সাম্য আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সন্তানজনন সম্ভব হইলেও অপর এক দম্পতীর সঙ্কল্পের সহিত নিজেদের সঙ্কল্পের মিল রাখিয়া সন্তানজনন করিবার চেষ্টা বহুলরূপে প্রচলিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্যই, যত সুনির্ব্বাচিত হইয়াই নরনারীর

বিবাহ হউক না কেন, স্বামিপত্নীর প্রকৃতির পার্থক্য কিছু থাকিবেই।

স্বামিপত্নীর প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বাভাবিক

একই পিতার ঔরসে ও একই মাতার গর্ভে জন্মিয়াও যখন ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকে, তখন ভিন্ন ভিন্ন জঠর-প্রসূত স্বামী ও স্ত্রী নামধারী দাম্পত্য জীবদ্বয়ের প্রকৃতির পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং এই বৈষম্যটাকে গায়ের জোরে চূর্ণ করিতে না চাহিয়া ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই গৃহীর জীবনকে সুখনিকেতন করিতে হইবে। আংশিক প্রকৃতিসাম্যদ্বারা বিবাহ নির্ব্বাচিত হইলে আধ্যাত্মিক উপায়ের দ্বারা পার্থক্যটুকুর অনিষ্টকারিতা সম্যক্ নিবারণ করা যায়। এইরূপ উপায়সমূহ **"আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য"** নামে আখ্যাত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিবাহ যে-ভাবে নির্ব্বাচিত হয়, তাহাতে বর-কন্যার আংশিক প্রকৃতিসাম্যও একটা দৈবাধীন ব্যাপার

বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা

মাত্র। সাধারণতঃ পাত্র-মনোনয়নে পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য নাই বলিয়া, এবং যেখানে কিছু বা মূল্য আছে, সেখানেও সাধারণতঃ পাত্রীর শিক্ষাদীক্ষা সংযত চিন্তা ও সংযত জীবনের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল নহে বলিয়া, বরকন্যার মিলনের মধ্যে, পরিণয়োৎ-সবের মঙ্গলশঙ্খের সুমধুর ধ্বনির মধ্যে মানসিক বিরোধের একটা বেসুরা প্রতিবাদ থাকিয়া যায়। কারণ, যেখানে বিবাহিত জীবনের ভালমন্দ বুঝিতে অক্ষমা বালিকাকে হঠাৎ একদিন একটী অজানা অচেনা আগন্তুকের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হয়, সেখানে বালিকার মনে প্রচণ্ড ভয়, শঙ্কা ও আতঙ্কই জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। কাহারও

কাহারও এই আতঙ্কটা পরে প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রী হইয়া স্বামীকে মনে মনে ভয় করে না, এমন নারীই বা কয়টী মিলিবে ? সাম্য ছাড়া ত' মিলন হয় না, বাঘে আর ছাগলে ত' বন্ধুত্ব জন্মে না ! প্রেম সমানে সমানেই হয়, অসমানে হয় না। স্বামী এবং স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য আবশ্যক, একথা পূর্ব্বে আমরা অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। বয়সের পার্থক্য থাকার অপর একটা কারণ এই যে, নারীর দেহ পুরুষদেহ অপেক্ষা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সান্তানিক যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু এই পার্থক্য মনের মিলের ব্যাঘাত করে না, অন্ততঃ স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে। যদিও মনের মিল আর একপ্রকৃতিকতা এক কথা নহে, তথাপি মনের মিল এক-প্রকৃতিকতা সাধনের পরম সহায়, একথা নিঃসন্দেহ। সুতরাং পাত্র-পাত্রীর মনের মিলন বুঝিয়া সম্বন্ধ-নির্ব্বাচন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুমোদিত। কিন্তু এখানেও গোল বাঁধিয়াছে। যে পাত্রী নিজের মনকে চিনে না, সে যতই লেখাপড়া শিখিয়া থাকুক না কেন, অপরের মনের সহিত নিজের মনের মিলন সে কেমন করিয়া ধরিবে ? যাহার মন নিজের আয়ত্ত নহে, যে নিজের মনের সঠিক হিসাব রাখিবার কৌশল জানে না, মনকে বশে রাখিবার, ঘষিয়া মাজিয়া মলমুক্ত করিবার অনুশীলন যে করে নাই, শতপথগামী, প্রমত্ত বা ব্যভিচারী মনকে সংযমের রশ্মিতে বাঁধিয়া রাখিবার যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে যে পদ্ধতিবদ্ধভাবে চেষ্টা করে নাই, কাহার সহিত তাহার মন মিলিল, আর, কাহার সহিত মিলিল না, ইহা সে কিরূপে বুঝিবে ? আজ যাহাকে মনের মিলন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে শুধু চ'খেরই ক্ষণস্থায়ী নেশা নহে, যাহাকে খাঁটি সোনা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা

স্বয়ম্বর বিবাহের অসম্পূর্ণতা

যে গিল্টি-করা পিতল নহে, যাহাকে হীরক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে ক্ষণভঙ্গুর কাচই নহে, তাহার নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে?

এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" দ্বারা। অসবর্ণ বিবাহ অথবা একই সমাজের বিভিন্ন পরিবারে প্রথার বিরুদ্ধে কন্যাদান বা স্বয়ম্বর বিবাহ স্বাধীন রুচিমত চলিতে পারে, কিন্তু বিবাহিত দম্পতীর পারস্পরিক শক্তিসাম্যে প্রয়োজিত পুরুষকারের দ্বারা দৈবের এই নির্বন্ধের দুঃখ ও বৈষম্যগুলির হাত এড়াইয়া চলা সম্ভব হইবে। কারণ, **মানুষের সহিত মানুষের পার্থক্যের মূল কারণসমূহ তাহাদের মনের প্রাক্তন সংস্কার এবং প্রচ্ছন্ন প্রবণতাসমূহের মধ্যেই রহিয়াছে।** স্বামী ও স্ত্রীর মনের সেই সকল প্রাক্তন সংস্কার এবং প্রচ্ছন্ন প্রবণতাগুলিকে ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ ও নির্বিষ করিতে পারিলে প্রকৃতির বৈষম্য তাহাদের কল্যাণকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" দ্বারা প্রকৃতি-বিরোধের এই মূল বিষকে নির্জ্জীব করা হয় এবং এই পরিশোধিত বিষদ্বারাই অমৃততুল্য মহৌষধের ফললাভ হয়, যেহেতু প্রকৃতি-পার্থক্য তখন বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া মিলনের মধ্যেই অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য

যেখানে স্বামিপত্নীর অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেখানে প্রকৃতির বৈষম্যটুকু "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" দ্বারা পরিশোধিত হইয়া গৃহিজীবনের লীলা-মাধুর্য্যকেই বর্দ্ধিত করে। আর, যেখানে প্রকৃতির সাম্য নাই, মনের মিলন নাই, মতামতের সাদৃশ্য নাই, পারস্পরিক প্রেম নাই, একে-অন্যে সহানুভূতি নাই, ধৈর্য্য ধরিয়া

নিয়মিতভাবে "আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্যের" অনুশীলন করিলে সেখানেও বজ্রদগ্ধ তরুতে নববসন্তের কোমল কিশলয় অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, মরুপ্রান্তরে প্রেমের মন্দাকিনী সুমধুর কুলুনাদে প্রবাহিত হয়।

নারী যখন "পতি-ভাব"-টার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা করেন, স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মনাম ভাবিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে জপ করেন, তাঁহার মূর্ত্তির ধ্যান করেন, তাঁহাকে পরাৎপর ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিভূতি ভাবিয়া তৎপ্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন, তখন তাঁহার মানসিক সংস্কার ও প্রবণতাগুলি স্বামীর সংস্কার ও প্রবণতাগুলির সহিত নিজ পার্থক্য রক্ষা করিয়াও অকল্যাণ প্রসবের ক্ষমতা হারায় এবং কল্যাণ বর্দ্ধনের সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু ইহাতে স্বামী স্বয়ং কোনও উৎকর্ষকে প্রাপ্ত হন না। এমন সতী নারীর স্বামী হওয়ার দরুণ যদি তাঁহার কোনও সুকৃতি লাভ হয়, তবে তাহা পত্নীর আশীর্ব্বাদে মাত্র। প্রকৃত কথা কহিতে কি, আমরা যে রামচন্দ্র, সত্যবান বা নলরাজাকে একটা পৃথক সম্মান দিয়া থাকি, তাহা শুধু তাঁহাদের ত্রিলোক-পূজিতা সহধর্ম্মিণী-সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর অক্ষয় পুণ্যে। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী না থাকিলে রামচন্দ্র, সত্যবান বা নলরাজা অপরাপর শতশত রাজা-মহারাজাদেরই ন্যায় থাকিতেন, বিশেষ একটা কিছু বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। নারী পতি-ভাবের সাধনায় নিজেকে বিকাইয়া দিয়া মহত্ত্ব লাভ করেন সত্য কিন্তু এই মহাসম্পদ হইতে স্বামী বেচারা বঞ্চিতই থাকিয়া যায়। কারণ, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীপূজা যেমন বদ্ধমূল শিষ্টাচার, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীপূজা তদ্বৎ

পতিভাবের নিকটে নারীর আত্মসমর্পণ

নহে। তন্ত্রশাস্ত্র কুলাচারী সাধককে স্ত্রীর প্রতি উপাস্যভাব আরোপ করিতে উপদেশ করিলেও সেই উপদেশ তেমন ভাবে পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তাহার প্রথম কারণ, এই যে, তন্ত্রধর্ম্মে সকলে সমভাবে আস্থাবান নহে। দ্বিতীয় কারণ, তান্ত্রিক সাধনায় ব্যভিচার ও কদাচারের দুরন্ত প্রশ্রয় আছে। তৃতীয় কারণ, তন্ত্রধর্ম্ম গৃহী সাধকদের উদ্ভাবিত ও অনুশীলিত ধর্ম্ম; সংসার-বিমুখ, ভোগসুখে অনাস্থাকারী, সন্ন্যাসীরা ইহার প্রচারক নহেন। অথচ, ভারতীয় হিন্দুজাতির স্বাভাবিক নেতৃত্বটা অধিকাংশ সময়ে যেন সন্ন্যাসীর হাতেই রহিয়াছে। বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, রামানুজ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী। হিন্দুজাতি গৃহীর শাসন মানেন নাই, তাহা নহে। নানক, কবীর এবং আধুনিক রামমোহন রায় সকলেই গৃহী ছিলেন। কিন্তু তথাপি ইহা অতি স্পষ্ট সত্য যে, সন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারকেরা যত সহজে বা যত সময়ে যাহা করিতে পারিয়াছেন, গৃহী ধর্ম্মপ্রচারকেরা তত সহজে বা তত সময়ে তাহা করিতে পারেন নাই। তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ তেমন ভাবে প্রতিপালিত না হইবার পক্ষে ইহা বড় তুচ্ছ কারণ নহে। চতুর্থ কারণ এই যে, যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের অনুরাগী এবং তদনুযায়ী সাধনকারী, তাঁহাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসরণ না করিয়া আচারকেই মূল বলিয়া ভাবিয়াছেন, নারিকেলের শস্যে উপেক্ষা করিয়া ছোবড়া চিবাইয়াছেন এবং তামসিক প্রকৃতির লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিকটে ছোবড়ার অতুলনীয় মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করিয়া শস্যের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি

পত্নীর প্রতি পতির উপাস্যভাব

তন্ত্রোক্ত অনুশাসন প্রতিপালিত হইল না কেন

সন্ন্যাসীদের প্রভাব

তান্ত্রিকাচারীর বীভৎসতা

ও অজ্ঞতা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রের আচার যতই কুৎসিত হউক, তন্ত্রের উপদেশে সত্য আছে। ইংরাজি শিখিয়া কুসংস্কারাবদ্ধ মাতালের প্রলাপ-বচন বলিয়া তন্ত্রকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, আমাদের যুক্তি তর্কের দাপটে তন্ত্র হয়ত প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ পাইবে না, কিন্তু উহাতে যাহা সত্য, তাহার মৃত্যু নাই। যে ভাবেই হউক, মস্তক প্রদক্ষিণ করাইয়া অন্ন গ্রাস ভোজনের মত করিয়া হইলেও, যাহা প্রকৃত সত্য, তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তালগাছের সাথে একটা জীবন্ত মানুষকে ফাঁসী লটকাইয়া দিলে তাহার জড় দেহটা মরিয়া যায় সত্য, কিন্তু যে আত্মা ঐ দেহটীকে আশ্রয় করিয়া নিজকে প্রকাশিত করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হয় না। একটী দেহের পতনে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া আত্মা নিজকে পুনরায় বিকশিত করেন। ঠিক তেমনি যে সত্য তন্ত্রশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিয়াছিলেন, যদি তন্ত্রচারীদের উদ্দেশ্য-বিস্মৃতি হেতু সেই শাস্ত্রকে ফাঁসী লটকাইয়া লীলাসাঙ্গ করিতে বাধ্য করিতে আমরা পারি, তাহা হইলেও সেই সত্য পুনরায় নূতন শাস্ত্রের মধ্য দিয়া অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। **তন্ত্রের বহু সত্যের মধ্যে একটী বড় সত্য এই যে, নারীও পূজার্হা। পুরুষ যেমন নারীর উপাস্য, নারীও তেমন পুরুষের উপাস্যা, পুরুষ যেমন নারীর ব্রহ্ম-প্রতীক, নারীও তেমন পুরুষের ব্রহ্ম-প্রতীক, চিত্তের যাবতীয় সাত্বিকী বৃত্তির উপচারে নারী যেমন পতিদেবতার অর্চনা**

তন্ত্রের উপদেশে সত্য আছে।

সত্যের ধ্বংস নাই

তন্ত্রের সত্য

করিবেন, পুরুষের পক্ষেও পত্নীদেবতা তেমনই অর্চ্চনীয়া। আদিকবি বাল্মিকী অবধি আজ পর্য্যন্ত সকলেই নারীর পতিপূজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পুরুষের পত্নীপূজার কথা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে এক তন্ত্র ছাড়া আর কেহ বলেন নাই।

তন্ত্রের সকল কথা আমরা মানি আর না মানি, প্রকারান্তরে হইলেও এই কথাটা আমাদিগকে মানিতেই হইবে। কারণ, নারীকে পূজা না করিয়া পুরুষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ভক্ত প্রেমভরে পাথরের বিগ্রহকে পূজা করিয়া নিজেই লাভবান হয়, প্রস্তরের তাহাতে কি যায় আসে?

নারীপূজার অভাবে পুরুষের ক্ষতি

এতদিন ধরিয়া স্ত্রীজাতি পতি-দেবতাকে পূজা করিয়া আসিয়াছেন,—পতিই সতীর গতি, পতিই সতীর প্রাণ, পতিই পুণ্য, পতিই গুরু, পতিই ঈশ্বর, পতিই পরম মোক্ষ,—এই সকল সৎসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ত্রীজাতি নিয়ত আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। পতি-ভাবটার কাছে আত্মসমর্পণ করিবার এই চেষ্টার ফলে তাঁহারা শতগুণশক্তিশালিনী সহিষ্ণুতা, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। যদিও পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিতে সচল রতিমন্দিরের অতিরিক্ত কিছু মনে করে না, তথাপি নারী পরদাররত স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিয়াছেন, প্রতিদান

স্ত্রীজাতির মহত্ত্বের প্রমাণ

পাইবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া উপদংশক্লিষ্ট বা কুষ্ঠ-জর্জ্জর স্বামীর সেবা অক্লান্ত অধ্যবসায়ে করিয়াছেন, যে স্বামীকে বর্জ্জন করিলে অন্তর্য্যামীর বিচারে স্ত্রী অনুমাত্র অপরাধিনী হন না, সেই বর্জ্জনীয় স্বামীর দুঃখদ সঙ্গকেও পরিহার না করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, পতিভাবটার কাছে আত্মসমর্পণের ফলে স্ত্রীজাতি প্রকৃতই কত বড় হইয়াছেন। যে দেয়, সে বড়, না যে দুহাত পাতিয়া লয়, সে বড়?

যে ভালবাসে সে বড়, না যে ভালবাসা পায়, সে বড়? যে সেবক, সে বড়, না যে সেবা গ্রহণ করে, সে বড়? ভক্ত বড়, না ভগবান্ বড়? বিচার করিয়া দেখ, নারীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা কত বড় হইয়া গিয়াছেন। নিজেকে বড় ভাবিয়া ভাবিয়া এভাবে পুরুষজাতি কেবল বঞ্চিতই হইয়াছে, তাহার মহত্বের ভাণ্ডার রিক্তই রহিয়া গিয়াছে।

নারীকে দাসীর জাতি মনে করিবার প্রতিফল

নারীকে দাসীর জাতি বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে পুরুষ হইয়াছে বলদর্পিতের ক্রীতদাস, আর জোর করিয়া পতিপূজা আদায় করিতে চাহিয়া পরিণত হইয়াছে নিরুদ্যম নপুংসকে। স্ত্রীজাতির চিরগুরুগিরির অটল সিংহাসনে আসীন হইয়া নিয়ত সে শুধু হুকুমের পর হুকুম চালাইয়াছে, অবাধ্যতার কল্পনামাত্রে উদ্যত দণ্ডে নারীর মস্তক চূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু নিজে কখনও গুরত্ব অর্জ্জনের চেষ্টাটুকুও আবশ্যকীয় মনে করে নাই। হইতে চাহিয়াছে সে স্ত্রীজাতির পরমেশ্বর, কিন্তু ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অপরিসীম প্রাণের টান, তাহার অনুশীলন করে নাই। ফলে, পুরুষের মনুষ্যত্বের মধ্যে একটা সুবিশাল অভাব, রিক্ততা ও শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই শূন্যতা বিদূরিত করিবার জন্যই সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা "আধ্যাত্মিক শক্তি সাম্যের" উপায় সমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহিরাচারের মধ্য দিয়া নহে, আন্তরিক প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া, পরস্পরকে পরস্পর পূজা করিয়া সমভাবে কল্যাণবন্ত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(চ) লক্ষ্যের একতানতাই দাম্পত্য জীবনের সকল সুখ, সৌভাগ্য ও সার্থকতার মূল। কিন্তু কি স্বামী কি পত্নী কাহারও পক্ষে জীবনের

লক্ষ্য নির্ণয় সহজ কথা নহে। একমাত্র যুক্তি-তর্কের সাহায্যে কাহারও লক্ষ্য নির্ণীত হইতে পারেনা, হৃদয়ের গতিবেগ বুঝিয়াই লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা যাহার চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় নাই, হৃদয়ের গতিবেগ তাহার পঙ্কিল থাকে। সেই পঙ্কিল প্রবাহে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্যনির্ণয়ের বা লক্ষ্যলাভের চেষ্টা বিড়ম্বনাই বটে। ভগবানকেই জীবনের একমাত্র পরিচালক জানিয়া তাঁহাকেই নিজেদের সকল প্রয়াস-স্পন্দনের মূলীভূত উৎসস্বরূপ বুঝিয়া যাঁহারা ভগবৎসাধনায় নিজ নিজ জীবনকে পরিশুদ্ধ করিতে শৈথিল্য না করেন, তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়ের গতিপ্রবাহ লক্ষ্যনির্ণয়ের পরম সহায়, অপরের পক্ষে অধিকাংশ স্থলে বিপথগমনে প্ররোচক মাত্র। নিজ নিজ হৃদয়ের বেগ ও আবেগকে তাহাদের যথার্থ স্বরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবার জন্য স্বামী এবং পত্নীকে তাহাদের সহিত দেশের ও জগতের কি কি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা নানাভাবে নানাবিধ কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। পুরুষেরা যখন সমাজের কল্যাণে নিজেদিগকে সমর্পণ করিয়া দিতে অগ্রসর হয়, তখন যদি তাহারা নিজ নিজ সহধর্ম্মিণী-দিগকে ঐসকল কল্যাণের কোন একটা অংশে আত্ম-দানের সুযোগ না দিতে পারে, তাহা হইলে দম্পতীর লক্ষ্যের একতানতা সম্পাদন বড় দুরূহ ব্যাপার। উভয়েই একলক্ষ্য কিনা অথবা একলক্ষ্যতার অভাব থাকিলে তাহার পরিমাণ কতটুকু এবং এই অভাবটুকু পূরণের শ্রেষ্ঠ উপায় কি হইতে পারে, তাহা উভয়ের একই কর্ম্মে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টার মধ্য দিয়াই ধরা পড়ে। কিন্তু একথা

দম্পতীর একলক্ষ্যতা

জীবনের লক্ষ্য চিনিবার উপায়

সমাজ-কল্যাণ অনুষ্ঠানে স্বামি-পত্নী উভয়ের যোগদান

আমরা স্বীকার করি না যে, প্রকাশ্য সভাস্থলে বাগ্মী স্বামীর অনুগমন করিলেই, এমন কি দুই এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেই স্ত্রী তাঁহার একলক্ষ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলেন, অথবা পরকল্যাণনিরতা সহধর্ম্মিণীর গুণের প্রশংসা বন্ধুসমাজে গাহিয়া বেড়াইলেই স্বামী তাঁহার একলক্ষ্যতা প্রমাণিত করিলেন।

মেকী একলক্ষ্যতা

একই কর্ম্মের মধ্যে নারী যখন প্রেরণাদাত্রী মহাশক্তি এবং পুরুষ যখন কর্ম্মাবতার সংগ্রাম-বিগ্রহ, তখনই উভয়ে যথার্থ একলক্ষ্য হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিব। তাঁহাদের লক্ষ্যের একতানতা সম্পাদনে বাহিরের লোকের প্রশংসা-গুঞ্জন বা করতালিধ্বনির কোনও অপরিহার্য্য আবশ্যকতা নাই, একের প্রতি অপরের সাত্ত্বিক মমত্ববোধ, একের মহিমায় অপরের শ্রদ্ধাসিক্ত বিশ্বাস এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতায় আস্থাই যথার্থ একপ্রাণতা ও একলক্ষ্যতা সাধনের একমাত্র উপায়।

(ছ) সাধনধর্ম্মের (Spiritual Principles and Practice) ঐক্য ব্যতীত দাম্পত্য সাধনার পরিপূর্ণতা অসম্ভব। যাহাদের আধ্যাত্মিক মতবাদ সদৃশ, তেমন দম্পতী যদি সদৃশ সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন-পরায়ণ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে আর শান্তির অপ্রতুলতা থাকে না। সাধনের বলেই ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য ও পার্থক্য প্রশমিত হয় এবং গৃহিজীবন দিনের পর দিন অমৃতায়মান হইয়া উঠিতে থাকে। **ভারতে এক মহা-দুর্দ্ধর্ষ, নববলে বলীয়ান প্রচণ্ড-শক্তি-সম্পন্ন, তেজোদৃপ্ত মহাজাতির সৃষ্টিব্যাপারের ইহাই মূল রহস্য।** স্বামি-

সাধন-ধর্ম্মের ঐক্য

পত্নীর সাধন-ধর্ম্মের ঐক্য হইতে যখন গৃহে গৃহে প্রকৃতিদত্ত কল্যাণ-সংস্কার-সম্পন্ন বীর পুত্রকন্যাগণ উদ্ভূত হইতে থাকিবে, সেই দিন হইতেই ইতিহাসে ভারতের যথার্থ গৌরবের অবতারণা লিখিত হইতে আরম্ভ করিবে। সমসাধক পিতামাতার সাধনজাত ও সঙ্কল্প-প্রসূত সন্তান-সন্ততিরা যেদিন ভারতের বুকে তাঁহাদের তরুণ চরণের অঙ্কপাত করিবেন, সেদিন পিতা-মাতার তপঃসাধনার অমৃতময় ফলই ইহাদিগকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, পার্শী ও শিখের পার্থক্য উপেক্ষা করিতে সামর্থ্য দান করিবে,—

সাধনধর্ম্মের অকপট ঐক্য ও অনুশীলনের সুদূর ফল

হিন্দু হিন্দু থাকিয়াই সেই মহাজাতিভুক্ত হইবেন, মুসলমান ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই জাতীয় শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিবেন, খ্রীষ্টান নিজস্বতা বিসর্জ্জন না দিয়াই ভারতীয় মহাজাতির মহিমাকে জাগাইয়া তুলিবেন; অপরদিকে রাজনীতি নিজেকে ভগবানের বিদ্রোহী বলিয়া ভাবিতে অক্ষম হইবে, বিবেকের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিরোধ অপসারিত হইবে, ধর্ম্মের সহিত স্বাদেশিকতার কলহের অবসান ঘটিবে।

দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের বহুপূর্ব্বেই স্বামিপত্নীর সাধনধর্ম্মের ঐক্য সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, এমন কি বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যে

হইলেই ভাল হয়। স্বামী যদি বিবাহের বহুপূর্ব্ব হইতেই কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট সাধনধর্ম্মকে অবলম্বনপূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে সাধন-পরায়ণ হইয়া থাকেন এবং দার-পরিগ্রহের পরে প্রথমতঃ ধারাবাহিক উপদেশাদি ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যাপনার দ্বারা নিজ ধর্ম্মমতে আস্থাবতী করিয়া তারপরে সহধর্ম্মিণীকে স্বকীয় সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত করান, তাহা হইলে অতি উত্তম হয়।

সাধনধর্ম্মের ঐক্য-স্থাপন বনাম দৈহিক সম্বন্ধ

জিতেন্দ্রিয় স্বামী ব্যতীত অপরের পক্ষে নিজ পত্নীকে নিজে দীক্ষাদান সুষ্ঠু নহে। কারণ, সেই সকল স্থলে পত্নীর জীবনে দীক্ষার উদ্দেশ্য এবং সুমঙ্গল প্রভাব অনেকটা বৃথা হইয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে। এইজন্য স্বামী ও পত্নীর পক্ষে একই গুরুর আশ্রয় গ্রহণই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচিন ব্যবস্থা। যেখানে বিবাহের পূর্ব্বেই বরকন্যা সদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ-করিয়াছিলেন, সেখানে বিবাহের পর উভয়ের বিভিন্ন সাধন-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উপযুক্ত সদ্‌গুরুর দ্বারা নূতন করিয়া অভিষিক্ত হইয়া লওয়া কোনো কোনো স্থলে প্রয়োজন। বিবাহের পরেও যেখানে রুচিপার্থক্য নিবন্ধন বিভিন্ন গুরুর আশ্রয়-হেতু সাধন-ধর্ম্মে বিভিন্নতা জন্মিয়াছে, সেখানেও ইহাই ব্যবস্থা।

কোন কোন সাধক-সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ স্বামীকেই গুরুর সমক্ষে বা গুরু-প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে নিজ নিজ পত্নীকে নিজে দীক্ষা দান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই দীক্ষাদান-কালে স্বামীকে সর্ব্বপ্রকারে গুরুভাব বর্জ্জন করিয়া "তৎপ্রতিনিধি-ভাব" রক্ষা করিতে হয়। এ সকল স্থলে স্বামীর যিনি গুরু, স্ত্রীরও তিনিই গুরু।

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর দীক্ষা

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা কতকটা গুরুশিষ্যার ন্যায় হইলেও সখাসখী

ভাবই এখানে প্রবল, গুরুশিষ্যাভাব আনুষঙ্গিক মাত্র। পরন্তু, গুরু ও শিষ্যার মধ্যে প্রবৃত্তির আকর্ষণ থাকিতে পারে না, থাকিলে গুরুশিষ্যা সম্বন্ধ মিথ্যা হইয়া যায়। এই জন্য দীক্ষাকালে স্বামী ও পত্নী উভয়েই নিজ নিজ মন গুরুপাদ-পদ্মে অর্পণ করিয়া দীক্ষা দান ও গ্রহণ করিবেন। স্বামী নিজের মধ্যে গুরুভাব রাখিলে পত্নীদেহ তাঁহার পক্ষে কন্যাদেহ হইবে। স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর দৃষ্টিতে গুরুই বটেন, কিন্তু "ব্রহ্মদাতা-গুরু" এই ভাবটা স্বামীর প্রতি থাকিলে স্বামিদেহ তাঁহার পক্ষে পিতৃদেহ হইবে। সুতরাং পরস্পারের মধ্যে দেহসম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইবে। গুরু ও শিষ্যার মধ্যে দেহসম্পর্ক থাকিতে পারে না, এমন কি ধর্ম্মের নাম দিয়াও না।

দীক্ষাকালীন চিত্তভাব

এদেশে বহু বহু সাধক-সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের নাম দিয়া গুরু-শিষ্যাতে কদর্য্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, অশিক্ষিত মহলে চিরাচরণের বা গতানুগতিকতার নিয়মে এবং শিক্ষিত মহলে দার্শনিকতার আড়াল দিয়া রাগমার্গের দোহাই দিয়া এখনও কতস্থানে হইতেছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতেই হইবে যে, ধর্ম্মার্থেও পিতাকন্যায় বা মাতাপুত্রে কামাচার চলিতে পারে না। লৌকিকভাবে গুরু ব্রহ্মদাতা পিতা, আর, শিষ্যা মানসী কন্যা।

গুরু শিষ্যার ভাব ও দৈহিক সম্বন্ধ

অলৌকিকভাবে গুরু ব্রহ্মের সহিত অভেদ পরমসত্তা, শিষ্যা তাঁহার সাত্ত্বিকী উপাসিকা। লৌকিকভাবে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে দেহসম্বন্ধ অকল্পনীয়, অলৌকিক ভাবে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে তামসিক অনুরাগ অকল্পনীয়। শিষ্যার পক্ষে গুরুকে অদেয় কি আছে? শিষ্যা গুরুকে তাঁহার সব-কিছু দিতে পারেন, কিন্তু পারেন না শুধু তাহা দিতে, যাহা সাত্ত্বিকতাবিহীন। এই জন্য শিষ্যা গুরুকে তাঁহার দেহ দান করিতে পারেন না। এমন কি,

গুরু ব্রহ্মদাতা পিতা, শিষ্যা মানসী কন্যা

সাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দেহের আদান-প্রদান চলিতে পারে না। কারণ, সাত্ত্বিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কামাচার সিদ্ধ-সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব হইলেও, যাহা কামাচার, তাহা কখনও কামের অপবাদ হইতে মুক্ত হয় না। যেখানে দেহের ব্যাপার রহিয়াছে, সেখানে আধ্যাত্মিক অবস্থা যতই উন্নত হউক না কেন, গুরু-শিষ্যা-ভাব-মূলক পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধাটা কিছুটা মলিন হইবেই। দেহ-সম্পর্কের দ্বারা কান্ত-কান্তা-ভাব মলিন হয় না, বরঞ্চ

দেহ-সম্পর্ক ও কান্ত-কান্তা-ভাব

স্থলবিশেষে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়, যেহেতু বীর্য্যাধানের দ্বারা স্ত্রীদেহ পুরুষদেহের আংশিক সগুণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা গুরু-ভাব অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ে এবং এই মালিন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত গুরু ও শিষ্যা উভয়ের ক্ষতি সাধন করে। কারণ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পাঠশালের শিক্ষক আর পড়ুয়ার সম্বন্ধ নহে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধের একটা পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা আছে, যাহা সাধন-ভজন করিতে করিতেই ক্রমে উপলব্ধ হয়, কোনও প্রকার যুক্তিতর্ক, আলোচনা বা বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা ঠিক্ ঠিক্ বুঝা বা বুঝান যায় না। সাধক গুরু সাধনেচ্ছু শিষ্যের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন, একথা আমরা সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকি। অনেকে এই কথাটীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইয়া ইহাতে অবিশ্বাসও করিয়া থাকেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও ব্যাপার প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের যতগুলি উপায় আছে, সেইগুলিকে যথাযথভাবে অবলম্বন করিয়া ধৈর্য্য সহকারে কাল-প্রতীক্ষা না করিলে অবিশ্বাস করিবার যথার্থ ও পূরাপূরি স্বত্ব জন্মে না, ইহাও যুক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শক্তিমান গুরু ও শক্তিমান শিষ্য

শক্তিমান গুরু নিজ মঙ্গলেচ্ছা দ্বারা, অকপট হিতৈষণাদ্বারা, নিঃস্বার্থ আশীর্ব্বাদের দ্বারা শিষ্যকে শক্তিমান করিয়া থাকেন। ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা তিনি যে ঈশ্বর-কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহা অদৃশ্য সূক্ষ্মগতিতে শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই শক্তি শিষ্যের সুপ্ত আত্মায় প্রচ্ছন্ন থাকে, একমাত্র সাধন-ভজনের দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। যখন ইহা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখনই গুরুশিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় হয়। সম্বন্ধটা এত মধুর এবং এত উচ্চ যে, ইহার আস্বাদন পাইয়া যাঁহারা গুরুস্তোত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা গুরুকে একেবারে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং,
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা-সাক্ষিভূতং,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

অর্থাৎ, সেই গুরুকে প্রণাম করি, যিনি সৎ, যিনি নিত্য-অস্তিত্বশীল, যাঁহার ধ্বংশ নাই। তিনি কেমন? না,—তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি ব্রহ্মের স্বয়মনুভূত আনন্দ-স্বরূপ, ব্রহ্মেতে সমাহিতচিত্ত হইলে যে অকথনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়, তিনি তৎস্বরূপ। তিনি কেমন? না,—তিনি সুখদাতা, যে সুখের উপরে আর সুখ নাই বা থাকিতে পারে না, তেমন পরম সুখের দাতা; যে সুখের পর অনিবার্য্যরূপে

গুরু-স্তোত্রের বিশদ ব্যাখ্যা

দুঃখ আসে, সেই ক্ষণস্থায়ী সুখ নহে, পরন্তু, যে সুখ দুঃখ-লেশহীন, যাঁহা নিমেষে ফুরাইয়া যায় না, জলবুদ্বুদের মতন কটাক্ষে লয় পায় না, তেমন সুখের দাতা। তিনি কেমন? না,—তিনি কেবল, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি একমাত্র, তিনি ছাড়া আর কেহ নাই, তিনি ছাড়া আর কেহ ছিল না, তিনি ছাড়া আর কেহ থাকিতে পারে না, তিনি ছাড়া আর কেহ থাকিবে না, এক তাঁহাকে পাইলেই কৈবল্য-লাভ। তিনি কেমন? না,—জ্ঞানই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার অন্য কোনও মূর্ত্তি নাই; তবু যদি কোনও মূর্ত্তি কল্পনা কর, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মূর্ত্তি মধ্যে তাঁহার প্রকাশকে জ্ঞান-যোগে অনুভব না করিতেছ, ততক্ষণ উহা তাঁহার মূর্ত্তি নহে, ততক্ষণ উহা সত্য নহে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি অনুভব করিলে, তিনি এখানে আছেন, এইখানে তাঁহার অসীম সত্তা সসীমের মধ্য দিয়াও প্রকাশিত হইতেছে, তন্মুহূর্ত্তে উহা তাঁহার মূর্ত্তি হইল, ইট-পাথর তাঁহার মূর্ত্তি হইল, মানুষ-গরু তাঁহার মূর্ত্তি হইল, প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় তাঁহার মূর্ত্তি হইল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মূর্ত্তি হইল। কারণ, জ্ঞানই তাহার মূর্ত্তি, এবং তোমার ব্রহ্মজ্ঞান এই সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, পারদ যেমন করিয়া স্বর্ণের অনুপরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে পারদীকৃত করিয়া ফেলে, তেমনি তোমার ব্রহ্মজ্ঞান নিখিল বিশ্বের অংশবিশেষের বা সমগ্রত্বের অনুপরমানুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ব্রহ্মীভূত করিয়া

ফেলিয়াছে। তিনি কেমন?—না, তিনি সকল দ্বন্দের অতীত, সকল বিরোধের উর্দ্ধে, সকল ভেদাভেদ-বুদ্ধির সীমারেখা অতিক্রম করিয়া। সসীমের সহিত অসীমের যে দ্বন্দ্ব, সুখের সহিত দুঃখের যে দ্বন্দ্ব, আলোকের সহিত অন্ধকারের যে দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বের সহিত অনস্তিত্বের যে দ্বন্দ্ব, জীবনের সহিত মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব, তিনি এই সকল যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরপারে অবস্থিত, ইহারা তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। তিনি কেমন?—না, গগন-সদৃশ। আকাশ যেমন অনন্ত ও উদার এবং আকাশ যেমন ধ্বনির মূল এবং প্রকাশক, তেমনই তিনি অনন্ত ও উদার এবং সর্ব্বমন্ত্রের মূল এবং প্রকাশক। আকাশ দীন-ধনী সকলের গৃহছাদের উপর দিয়া উদার চন্দ্রাতপ বিছাইয়া রাখিয়াছে, আকাশ হইতে পরমনাদ ওঁকার মহামন্ত্র উত্থিত হইতেছে, জীবের কর্ণাভ্যন্তরস্থ আকাশই উহার প্রতিস্পন্দন গ্রহণ করিতেছে। তিনি ঠিক এমনই উদার, তিনি ঠিক এমনই মন্ত্রমূল। তিনি কেমন?—না, তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্য। ব্রহ্মবাদি ঋষি শিষ্যকে উপদেশ করিবার কালে বলিয়া থাকেন,—"হে শিষ্য, তৎ ত্বম্ অসি, তুমিই সেই, তুমিই ব্রহ্ম তুমিই নিষ্কল নিরঞ্জন পরম-মহেশ্বর, তুমিই পরমপুরুষ।" এই সকল মহাবাক্যযোগে যে শাশ্বত সনাতন পরমদেবতার কথা বলা হইতেছে, তিনি তাহাই। তিনি কেমন?—না, শত সহস্র রূপে প্রকটিত হইলেও তিনি বহু নহেন, তিনি এক। জ্ঞানীরা বিভিন্ন জনে

তাঁহাকে বহুরূপে বলিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি একই আছেন। বহুজনে তাঁহার বহুরূপে স্তুতি করিয়াছেন, বহুজনে তাঁহাকে বহুরূপে দর্শন করিয়াছেন, বহুজনে তাঁহাকে পাইবার বহুপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে বহু নহেন, তিনি এক। তিনি কেমন ?—না, তিনি নিত্য, অতীত কালেও ছিলেন, বর্ত্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন, তাঁহার বিনাশ নাই। তিনি কেমন ?—না, তিনি বিমল, সর্ব্বপ্রকার মল বা পাপ হইতে মুক্ত, তিনি নির্ম্মল, তিনি নিত্যশুদ্ধ, তিনি অপাপবিদ্ধ। তিনি অচল, তিনি অচঞ্চল, তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি শান্ত। তিনি কেমন ?—না, তিনি আমার সকল চিন্তা ও চেষ্টার নিয়ত সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া আমার বুদ্ধি চলিতে পারে না, তাঁহার লক্ষ্যের অগোচরে কোনও ভাব ও কর্ম্ম সম্ভব নহে। তিনি কেমন ? —না, ভাবাতীত। সাধ্য কি মানবের যে চিন্তা দ্বারা তাঁহার সীমা পরিসীমা করিবে ? মানুষের বাক্য তাঁহাকে বিচার করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে, কিন্তু বিচার করা আর হইয়া উঠিবে না। মানুষের মেধা, মানুষের মণীষা অনন্ত ঊর্দ্ধে স্থিত তাঁহার তত্ত্বকে না পাইয়া লজ্জাবনত-কন্ধরে মূক-ভাবেই অবস্থান করে। তিনি কেমন ?—না ত্রিগুণ-রহিত। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে কিন্তু যুগপৎ তিনি গুণময় এবং নির্গুণভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া গুণত্রয় তাঁহাকে অভিভূত

করিতে পারেনা। তিনি এমনই অবর্ণনীয়, তিনি এমনই মহান্।

কামাচাররূপ মেঘ দ্বারা এই মধুর ও মহান্ তত্ত্ব আবৃত হয়, তাই মধ্যাহ্নকালেও সূর্য্য-কিরণ সাধকের জীবনকে আলোকিত করে না। তাই গুরুশিষ্য সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতেই হইবে। এই জন্যই

গুরুশিষ্য সম্বন্ধের নিষ্কামতা

দীক্ষাদান ও গ্রহণকালে স্বামীর গুরুভাব এবং পত্নীর গুরুশ্রদ্ধা, স্বামীর যিনি গুরু, তাঁহার অথবা ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত থাকিবে। ইহাতেই পরিপূর্ণ সুফল লাভ হইবে।

সাধন-ভজন করিতে করিতে ভাগ্যবতী পত্নীর এমন অবস্থা আসিতে পারে যে,—

(১) **গুরুদেবের,**
(২) **স্বামীর,**
(৩) **মন্ত্রের,**
(৪) **ব্রহ্মের, ও**
(৫) **নিজের**

মধ্যেই ইষ্টস্ফূর্ত্তি পাইবে। পাঁচটী স্থানে ইষ্ট-স্ফূর্ত্তি হইলেও ব্যবহারিক ভাবে পাঁচটী বিষয়ে পত্নী পাঁচটী পৃথক আচার পালন করিবেন। **গুরুতে অর্থাৎ স্বামীর দীক্ষাদাতাতে**

সাধনবতী কুলবধূর পঞ্চভাব ও লোকাচার

ইষ্টভাব জন্মিলেও তাঁহার প্রতি ব্যবহার কন্যার মতই থাকিবে। **স্বামীতে ইষ্টভাব জন্মিলেও** তাঁহার প্রতি ব্যবহার পত্নীর মতই থাকিবে। **মন্ত্রে ইষ্টভাব জন্মিলেও** মন্ত্রের ব্যবহার গোপনই থাকিবে। **সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে ইষ্টভাব জন্মিলেও** সীমাবদ্ধভাবে ব্রহ্মোপাসনার যে সব

নিরপরাধ প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রতিবাদহীন হইতে হইবে। **নিজেতে ব্রহ্মভাব জাগিলেও** অপরের নিকট কুলবধূর যোগ্যমতই চলিতে হইবে। **গুরুতে ইষ্টভাব জাগিলে** তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা সম্ভব হয়, তখন আর কিছু অদেয় থাকে না। কিন্তু কন্যা যাহা গনে মনে বা প্রকাশ্যে পিতাকে দান করিতে পারেন, গুরুকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ জানিলেও শিষ্যা শুধু তাহাই দিবেন। **স্বামীতে ইষ্টভাব জন্মিলে** কামভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দেহসুখ প্রার্থনাব-অতীত হইয়া যায়, লোলুপতা নাশ পায়, কিন্তু স্বামীর সহিত যে সকল ব্যবহার লোককল্যাণার্থ প্রয়োজন, স্বামীকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ জানিলেও পত্নী তাহার অবিরোধী থাকিবেন। গুরুদেব কৃপা করিয়া যে মহামন্ত্র স্বামীকে দিয়াছেন এবং গুরুর আদেশক্রমে তাঁহারই আশীর্ব্বাদসহ স্বামী বাহকরূপে (গুরুরূপে নহে) পরিবেশন করিয়াছেন, সেই **মহা-মন্ত্রকেই ইষ্টস্বরূপ বুঝিলে** মনে হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া এই নামের রস সম্ভোগ করি। ইচ্ছা করে, চতুর্দ্দিকে শ্রীনাম লিখিয়া রাখি, যেন, যেদিকে নয়ন পড়ে, সেই দিকেই শ্রীনাম দেখিতে পাই। ইচ্ছা করে, জগৎ ভরিয়া সকলকে ডাকিয়া এই মহানাম কীর্ত্তন করিতে বলি, যেন, শুনিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা করে, উচ্চৈঃস্বরে এই মহানাম কীর্ত্তন করিয়া রসনা সার্থক করি। ইচ্ছা করে, সর্ব্বাঙ্গে মহামন্ত্রের তিলক কাটিয়া সেই সুখস্পর্শ অনুভব করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত-তনু হই। কিন্তু এই সাত্বিকী পিপাসাকে নিবারিত করিয়া একমাত্র মন দিয়াই নামের সেবা করিতে হইবে। মন সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা। রাজা নিজে যদি শ্রীনামের পরিচর্য্যা করেন, তবে চক্ষুকর্ণাদি ভৃত্যবর্গ সেবা না করিলেই বা কি যায় আসে? ইষ্টস্বরূপ যে মহামন্ত্র, তাহাকে অন্তরের অন্তরে গোপন করিয়া রাখিতে হইবে,

নিবিড়তম প্রকোষ্ঠে প্রাণযোগে পূজা করিতে হইবে। **সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে ইষ্টলাভ জন্মিলে** আর সীমাবদ্ধভাবে মূর্ত্তি গড়িয়া বা পট আঁকিয়া তাঁহার উপাসনার প্রতি চিত্ত আসক্ত হয় না। তখন মনে হয়, এই সকল ছেলে-খেলা মাত্র, অবোধ শিশুর দুই দণ্ডের জন্য মন ভুলাইয়া সংসার-দুঃখ হইতে সাময়িক মুক্তি পাইবার ফন্দী মাত্র। তখন মনে হয়, আমার প্রাণের প্রাণ জগজ্জননীর আবার আবাহনই বা কি, বিসর্জ্জনই বা কি, তাঁহার পূজা করিবার আবার সময়ই বা কি, অসময়ই বা কি ? কিন্তু এমন শ্লাঘ্য উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াও, যাহারা এ উচ্চভাবের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ নহে, তাহাদের নিকট মৌনী থাকিতে হইবে। আর, **নিজেতে ব্রহ্মভাবের উন্মেষ হইলে** ভেদাভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়, জাতিকুলের বিচার থাকে না, আচার-বিচার বাছিবার প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু একই জীব ব্রহ্মভাবে এক, জীবভাবে আর। জীবজগতের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াও তিনি, জীবভাবে যাহা আদর্শস্থানীয়, তেমন আচার পালন করিবেন এবং জীবভাবে যাহা অনর্হ অসদাচার, তাহা পরিহার করিবেন।

দীক্ষায় অবিশ্বাসীর কর্ত্তব্য

যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ ও গুরুকরণে বিশ্বাসী নহেন, সেই সকল স্বামীপত্নীর পক্ষেও নিজেদের রুচি অনুযায়ী একটা সাধন-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে চেষ্টিত হওয়া উচিত। **দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনাই উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে, সাধনই প্রথম এবং প্রধান কথা। দার্শনিক চিন্তায় বুদ্ধির উৎকর্ষ**

সাধিত হয় বটে, কিন্তু প্রাণের অফুরন্ত পিপাসা মিটাইবার ক্ষমতা শুধু সাধনেরই আছে। দীক্ষাগ্রহণ বড় কথা নহে, সাধন করাই বড় কথা। হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা লইয়া তারপরে সাধন-ভজন না করার এবং গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধা-অমর্য্যাদা করার চাইতে একেবারেই দীক্ষা না নেওয়া ভাল কথা এবং নিজের মতানুযায়ী সাধনই দৃঢ়া নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত উৎসাহ-সহকারে অপরাজেয় উদ্যমে করিয়া যাওয়া অত্যুত্তম। গতানুগতিকতায় জীবন জাগে না, জীবন জাগে তপস্যায়।

একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা

(জ) পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সঞ্জননের জন্য পতিপত্নী উভয়কেই নিয়ত যত্নবান্ থাকিতে হইবে। যাহার চরিত্রের মধ্যে যেটুকু উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহার প্রতি তাহাকে সবিশেষ মনোযোগ দিয়া সেই উৎকর্ষ-টুকুকে বর্দ্ধিত করিয়া পরস্পরের শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে হইবে। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে একটা ইন্দ্রিয়াতুর সম্ভোগাসক্ত সুখলিপ্সা-কাতর কুক্কুরী ও কুক্কুর মনে না করিয়া, জিতেন্দ্রিয় দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং একটা পশুকে খুসী করিতে হইলে যেভাবে চলিতে হয়, সেভাবে না চলিয়া, একজন দেবতারও শ্রদ্ধিত যেভাবে হইতে হয়, সেইভাবে চলিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামি-পত্নী পরস্পরের কাছ হইতে শ্রদ্ধা চাহে না, চাহে অনুরাগ, চাহে প্রেম;

তাই নিজেকে শ্রদ্ধিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষাও অপরকে শ্রদ্ধা করিতে প্রয়াসশীল হওয়ায় দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। এজগতে অপরকে যে যত নির্ব্বিচারে শ্রদ্ধা করিতে পারে, সেই তত অবিসংবাদিতরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করে। পত্নীর দোষ থাকিলে স্বামী এবং স্বামীর দোষ থাকিলে পত্নী তাহা নিজ নিজ প্রেমের প্রভাব দিয়া সংশোধিত করিয়া লইতে সর্ব্বদা সযত্ন থাকিবেন এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটীকে সমালোচকের নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহার জীবনের বিরাট মহিমার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া শ্রদ্ধার মধুসিক্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের চরিত্রের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিবেন।

(ঝ) স্বাধীনতার স্পৃহা জীবমাত্রেরই মধ্যে প্রকৃতিদত্ত। জীব যখন নিজকে সমাজবদ্ধ করে, তাহার স্বাধীনতা-স্পৃহাই তাহাকে তখন এক বিষয়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অলোভনীয় বিষয়সমূহের স্বাধীনতা বর্জ্জন করিতে বাধ্য করে। স্বামী এবং পত্নী যখন গভীর অনুরাগের মধ্য দিয়া পরস্পরের স্পর্শ পাইতে আরম্ভ করেন, তখন অনেক সময় তাঁহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা আত্মগোপন করিয়া রহে সত্য, কিন্তু একের নিকটে অপরের সর্ব্বতোভাবে এবং সম্যগ্‌রূপ সাত্ত্বিক আত্মসমর্পণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্পৃহাটী লুপ্ত হয় না। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে দিব্য প্রেমের আবির্ভাবের দ্বারা ব্যক্তিবুদ্ধির অবসান না ঘটিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একের স্বাধীনতার প্রতি অপরের সম্মানবোধ থাকা একান্তই আবশ্যক। **নারী যতদিন নিজকে নির্য্যাতিতা নিগৃহীতা বন্দিনী বলিয়া মনে করিবে এবং পুরুষ যতদিন নারীকে তাহার পথের কণ্টক বা পায়ের**

একের স্বাধীনতার প্রতি অপরের সম্মানবোধ

শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিবে, ততদিন দাম্পত্য জীবন ব্যর্থতাই চয়ন করিবে। পুরুষ যতদিন নারীর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশকে বাধাদান করিবে এবং নারী পুরুষের জীবনকে নাগপাশে বাঁধিতে চাহিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবন একটা করুণ-রসাত্মক বিয়োগান্ত নাট্যই থাকিবে। পুরুষ-জাতি যতদিন পর্য্যন্ত নারীজাতির উপরে নিজ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার বিধাতৃদত্ত শক্তি-সমূহের অপব্যবহার করিবে এবং নারী-জাতি যত-দিন পর্য্যন্ত পুরুষকে নিজের আয়ত্তে আনিবার জন্য লালসার জাল বিস্তার করিতে চাহিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গৃহীর গৃহ সাহারার মরুভূমিরই ন্যায় শুধু অতৃপ্য পিপাসা এবং মায়া-মরীচিকার সৃষ্টি করিবে। পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত নারীর চতুর্দ্দিকে কারাগারের লৌহপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিকটে লজ্জিত না হইবে এবং নারী যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ পশুকে তাহার রক্ত মাংসের প্রতিমা-টার পায়ে বলিদান করিতে বিরত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সংসারীর সংসার হইতে দাসত্ব ও মৃত্যুর বিভীষিকা বিদূরিত হইবে না। ততদিন পর্য্যন্ত

নারী ও পুরুষ কতকাল পরস্পরের শত্রু থাকিবে

পুরুষ নারীর দাস এবং নারী পুরুষের দাসী থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ নারীর নিকটে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত এবং নারী পুরুষের নিকটে সাক্ষাৎ কাল-ভুজঙ্গিনী থাকিবে।

এই জন্যই পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ থাকা নিরতিশয় প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি কি, তাহা দাম্পত্য সাধকেরা নিজ নিজ জীবনের উৎকর্ষের পরিমাণ এবং পারস্পরিক প্রীতির গভীরতা দিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন; কোনও লোক-গুরু বা গ্রন্থকারের সাধ্য নাই যে, এই বিষয়ে কোনও সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দম্পতীকে ভাবুকতার আবশ্যকতা হইতে মুক্তি দিতে পারেন।

দাম্পত্য স্বাধীনতার স্বরূপ

কিন্তু এইটুকু আমরা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য জগতে দাম্পত্য স্বাধীনতার দাবী যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে ভারতীয় দাম্পত্য স্বাধীনতা তাহা হইতে নিজ প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রকার পার্থক্যকে সযত্নেই রক্ষা করিয়া চলিবে। নিয়ত-পরিবর্দ্ধনশীল যে স্বাধীনতার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত হইয়া য়ুরোপীয় নরনারী দাম্পত্য বন্ধনের অচ্ছেদ্যতাকে একটা দুর্ব্বহ ভার এবং গুরুতর বাধাস্বরূপ মনে করিতে বাধ্য হইতেছে, যে স্বাধীনতার দুঃস্বপ্ন-প্রভাবে পশুবৎ স্বাধীন প্রেমের অনুশীলনের সামাজিক অন্তরায় সমূহকে

দাম্পত্য স্বাধীনতার পাশ্চাত্য দুঃস্বপ্ন

পাশ্চাত্য দম্পতী একান্ত অসহনীয় বলিয়া ভাবিতেছে, যে স্বাধীনতার আকুল প্রার্থনা বিবাহকে অনুরাগ-বঞ্চিত ও বিবাহ-বন্ধনকে যন্ত্রণাপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে, নিশ্চয়ই ভারত সে স্বাধীনতাকে * গ্রহণ করিবে না! স্বাধীনতার যে বিষ-বল্লরীতে পাশ্চাত্য জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদের

* ফরাসীলেখক প্রফেসার লেটুরন্যু যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে যত সংখ্যক নরনারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্যের অন্ধ তাড়নায় সেই সংখ্যার দশভাগের এক ভাগ নরনারী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পরে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুপাত সওয়া দুইগুণ বাড়িয়াছে। হল্যাণ্ডে ইহার অনুপাত এই ত্রিশ বৎসরে দেড়গুণ, সুইডেনে কিঞ্চিদধিক দেড়গুণ এবং বেলজিয়মে প্রায় সওয়া চারিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অপরাপর দেশীয় সমাজতত্ত্ববিদ লেখকগণের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেণী,রুষিয়া প্রভৃতি যুরোপীয় অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকাতে,বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে (United States) এই দুর্ভাগ্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে (Indian Daily News,February 25,1920) দেখা গিয়াছিল যে, ১৯১৯ সালে শুধু নিউইয়র্ক জেলাতেই একহাজার তিনশতের অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার বিচার হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক জষ্টিস্ গ্রীণবম এবং জষ্টিস ডেভিস্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, নৈতিক অবনতিই এই সকল বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। যে দাম্পত্য স্বাধীনতা লাভের জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকা উল্লম্ফন করিতেছে, তাহা তাহাদের নৈতিক দুর্গতিকে রুদ্ধ না করিয়া অবারিত করিতেছে। স্বাধীন প্রেম তাহাদের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করিতেছে, পশুত্বের তাণ্ডব লীলায় প্রস্ফুটন ঘটাইতেছে। বাংলার তথা ভারতের কোনও জেলায় যদি এক বৎসরের মধ্যে এক-হাজার তিনশত স্বামী বা স্ত্রীকে তাহার স্ত্রী বা স্বামীর অসচ্চরিত্রতা প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে কোন দিন হয়, তবে তাহা কি আমাদের গৌরবের বা উন্নতির দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে?

হলাহলপূর্ণ মাকালফল গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিতেছে, নিশ্চয়ই ভারতের উর্ব্বর মৃত্তিকা তাহার বিষময় বীজকে স্বকীয় বক্ষে ধারণ করিতে অস্বীকার করিবে এবং যদিই কোনও অদূরদর্শী অবিমৃষ্যকারীর মহামূর্খতা এই অকল্যাণের বীজকে পাশ্চাত্য হইতে ভারতে আনিয়া বপন করিতে চাহে, নিশ্চিতই ভারতের মেঘ তাহাতে বারি-বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত রহিবে। ভারতীর সাধনার মধ্য দিয়া ভারতীয় প্রতিভার আশ্চর্য্য অবদানরূপে স্বাধীনতার যে দ্রাক্ষালতিকা অঙ্কুরিত হইবে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্র হইতে সকল আগাছা উৎপাটিত করিয়া সেই লতিকাকেই আমরা রোপিত, প্রবর্দ্ধিত, পল্লবিত এবং স্তবকে স্তবকে সুমধুর ফলভারে অবনমিত দেখিয়া নয়ন জুড়াইতে চাহি।

> দাম্পত্য স্বাধীনতা ও ভারতীয় প্রতিভা

দাম্পত্য স্বাধীনতার দাবী যখন পারস্পরিক-অধীনতাকে (Inter-dependence) অস্বীকার করে, তখন উহা সহস্র প্রকারে জাতীয় জীবনে ধ্বংসের বিস্তার করে। তখন হয় উহা নির্ব্বিচার (Promiscuous) যৌন-সম্বন্ধের প্ররোচনাদ্বারা জাতির নৈতিক মৃত্যুকে আনয়ন করে, নতুবা উহা সর্ব্বপ্রকার যৌন-সম্বন্ধকে রহিত করিয়া জাতির নির্ব্বংশ সাধন করে। এই দুইটী অবস্থাই আশঙ্কাজনক ব্যাপার। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থাটী হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ, পরার্থে-সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-ব্রত কঠোর সাধক ও সাধিকা ব্যতীত সাধারণেরা যৌন-আকর্ষণ হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি, দাম্পত্য জীবনের দুঃখগুলি দেখিয়া ভয় পাইয়াই যাহারা কৌমার্য্য গ্রহণ করে, অপর কোনও উৎকৃষ্টতর প্রেরণা যাহা-

> দাম্পত্য স্বাধীনতা বনাম পারস্পরিক অধীনতা

দের কৌমার্য্যের মূলদেশে নাই, তাহারা চির-কৌমার্য্যের মানমর্য্যাদা * রক্ষা করিতে পারে না। ফলে, প্রকাশ্য ভাবে গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া অন্তরমধ্যস্থ যৌনসুখ-কামনার পরিতৃপ্তি দান করিবার সৎসাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে ঐ কামনা অবৈধ পথে প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বেগবতী গতি পরিচালনা করে। সুতরাং, দাম্পত্য স্বাধীনতার দাবী যদি পারস্পরিক অধীনতাকে অস্বীকার করিতে চাহে, তাহা হইলে বিবাহ প্রথাটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইয়া যৌন জীবনে একটা ঘোরতর

---

* পৃথিবীর সকল দেশেই বিবাহ না করিবার বাতিকগ্রস্ত একশ্রেণীর লোক আছে। তাহারা পরহিতার্থ ও আত্মমোক্ষার্থ সন্ন্যাস লইতে স্বীকৃত নহে কিন্তু বিবাহ করিতেও প্রস্তুত নহে। সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করাই ইহাদের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য না হইলেও আত্মসুখ-সেবাই অধিকাংশ স্থলে ইহাদের ভবিতব্য হইয়া দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর কৌমার্য্য আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত নাই, কিন্তু নানা লক্ষণে মনে হইতেছে, প্রচলনের ভঙ্গীটুকু প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ কৌমার্য্যের দ্বারা আমরা কিরূপ লাভবান্ হইব, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতেছে। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অ্যাডল্ফি বার্লিটন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিবাহ বিষয়ে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বদেশীয় সমাজ-মধ্যে প্রচুর উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি একথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন, যে, ফরাসদেশীয় জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নরনারী যে বিবাহিত জীবনকে অস্বীকার করিয়া কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদ্বারা ফরাসী জাতির দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতি বাড়িয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবাহিত দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ অবিবাহিতেরা অধিকতর ক্ষয়প্রবণ ও অপকর্ষপ্রাপ্ত এবং সকল বয়সেই কৌমার্য্যাবলম্বীরা বিবাহিত নরনারীদের অপেক্ষা দ্বিগুণ হারে ইহলীলা সাঙ্গ করে। বিবাহিত নরনারীদের মধ্যে উন্মত্ততা, আত্মহত্যা, পরস্বাপহরণ-চেষ্টা, নরহত্যা ও বলাৎকার প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের পরিমাণ যত, ফরাসী তথাকথিত কুমার-কুমারীদের মধ্যে তাহার পরিমাণ উহার দ্বিগুণ। ফলে, বিবাহিত দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীদের জন্য রাজসরকারকে যত-সংখ্যক কারাগার, পাগলা গারদ, হাসপাতাল, পুলিশ ও শুশ্রূষাকারী রাখিতে হয়,

বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের সৃষ্টি হইবে। সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত কেহই যৌন জীবনকে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কি নারী কি পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই সম্পূর্ণ জিতকাম ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে, এমন অবস্থা দাঁড়াইবে যে, নবজাত সন্তানের জনকের পরিচয় পাইবার জন্য তাহার সহিত জেলা-জোড়া সকল লোকের মুখ-সাদৃশ্য বিচার করিতে হইবে। এই অকথনীয় অবস্থায় জাতীয় জীবনের যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিয়াই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—"বরং ভিক্ষা

অবিবাহিত এক-তৃতীয়াংশ নরনারীদের জন্য তাহার দ্বিগুণ কারাগার, পাগলা গারদ, হাসপাতাল, পুলিশ ও শুশ্রূষাকারীর ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ চিরকুমার ও চির-কুমারীরা বিবাহিত ও বিবাহিতাদের অপেক্ষা চারিগুণ দুর্নীতি-পরায়ণ। এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে, অবিবাহের পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের গ্রহণীয় কিনা। ভারতবর্ষে কৌমার্য্যের সম্মান আছে, কিন্তু তাহার আদর্শও পৃথক্। পাশ্চাত্য পুরুষের কৌমার্য্য অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, পাশ্চাত্য নারীর কৌমার্য্য অধিকাংশ স্থলেই সন্তানপ্রসবের বেদনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমানে ঔষধের দ্বারা পুংবীজকে ইচ্ছামত জননশক্তিহীন ও জরায়ু অস্ত্রোপচার করিয়া নারিদেহকে ইচ্ছামত সন্তান প্রসবে অক্ষম করিবার যে বৈজ্ঞানিকচেষ্টা ইয়োরামেরিকায় চলিতেছে, তাহা সফল হইলে এই কৌমার্য্যের বালাই আর থামিবে না। পরন্তু ভারতীয় কৌমার্য্যের আদর্শ হইতেছে পবিত্রতা ও পরার্থে উৎসর্গ। যাহার বীর্য্যে শত শত সন্তান জননের ক্ষমতা রহিয়াছে, স্ত্রীপুত্রের ভারবহনে যিনি অনুমাত্র অক্ষম নহেন, তিনিও এই আদর্শের মুখ চাহিয়া চিরকৌমার-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে নারী শত সন্তান জঠরে ধরিয়াও প্রসবক্লেশকে একটা ক্লেশের মধ্যে গণনা করেন না, তিনিও পবিত্রতা ও পরার্থের মোহনবংশী শুনিয়া, কৌমার্য্যকে আলিঙ্গন করেন। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় কৌমার্য্য ভারতীয় আদর্শকে ধরিয়া রাখিবে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সন্তানের জন্মরোধ করিবার বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইবে, তন্মুহূর্ত্তে পাশ্চাত্য কৌমার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

মাগিয়া খাইব, তথাপি এমন জাতিধ্বংশকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না।" যৌন যথেচ্ছাচারের শোচনায় পরিণাম বুঝিয়াই বিগত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোত্তম দেখিয়া স্বজাতির কল্যাণপ্রার্থী কোন কোন ইংরেজ মহাত্মা যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন জাতির শোণিতগত মিশ্রণের দ্বারা কখনও কখনও জাতিগত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, একথা বৈজ্ঞানিকেরা একপ্রকার প্রমাণিত করিয়াছেন। অবশ্য, বিরুদ্ধমতও নিতান্ত নগণ্য নহে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দাম্পত্য দায়িত্ব হইতে মুক্ত যৌন সম্বন্ধ রক্তের যে মিশ্রণ ঘটাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা জাতি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ভারতভূমি শক, হুন, আহোম, মগ, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি শত শত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জাতির সহিত শোণিত-সম্বন্ধ ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া লইয়াছে, তাহাদের বংশধরদিগকে এই ভারত-ভূমিরই রক্তমাংস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু বিবাহ ব্যতীত, দাম্পত্য-দায়িত্ব-রহিত, শোণিত-মিশ্রণকে অনুমোদন করে নাই। বলিতে কি, এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক সাধনার যুগে কত কত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বংশে রজক, চণ্ডাল প্রভৃতির কন্যার সহিত এমন কি পাঠান-নারীর সহিতও রক্ত-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও তাহাকে শৈবমতে বিবাহ না করিয়া এবং সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিতা না করিয়া নয়। **মোট কথা, অসবর্ণ বিবাহ অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু বিবাহ ব্যতীত শোণিত-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না।** বিবাহবন্ধনকে অস্বীকার করিতে চাহিয়া য়ুরোপ কি বড় সুখী হইয়াছে? এই

বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির শোণিতগত মিশ্রণ

বিবাহ বন্ধন ব্যতীত শোণিত সম্পর্ক

যে দিনের পর দিন য়ুরোপের প্রতি পল্লী জারজ * সন্তান-সন্ততিগুলির দ্বারা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, এই যে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিজেদের জন্মদাতা

* ফরাসী লেখক প্রফেসার লেটুরন্যু ফ্রান্স ও সুইডেনের জারজ সন্তানদের সংখ্যার নিম্নরূপ যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

=প্রতি দশ হাজার নবজাত শিশুতে=

ফ্রান্স	১৮০০—১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে	...	...	৪৭৫টী জারজ
	১৮০৬—১৮১০ ,,	...	...	৫৪৩টী ,,
	১৮২১—১৮২৫ ,,	...	...	৭১৬টী ,,

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অসবর্ণ, আন্তর্জ্জাতিক ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও দিন দিন ফ্রান্সের জারজ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রতি দশ হাজার জন্মে ৭১৬—৪৭৫=২৪১টী বাড়িয়াছে। এই হারে বাড়িয়া চলিলে এক সহস্র বৎসর পর ফ্রান্সে অ-জারজ সন্তান কতটী থাকিবে, গণিতজ্ঞ পাঠক তাহার হিসাব করিয়া দেখিবেন।

=প্রতি শত নবজাত শিশুতে=

স্কটল্যাণ্ড	১১৭৬খ্রীষ্টাব্দে	...	...	প্রায় ৩টী জারজ।
	১৮৬৬ ”	...	...	প্রায় ১০টী জারজ।

দেখা যাইতেছে ৯০ বৎসরে জারজের সংখ্যা তিন গুণের অধিক বাড়িয়াছে।

বাংলা ১৩৪১ সালের ২২শে চৈত্রের "নবশক্তিতে" একজন লেখক ইংল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র-সচিবের দপ্তরে তৈরী সরকারী তালিকা হইতে দেখাইতেছেন যে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে মোট শিশু জন্মিয়াছে ছয় লক্ষ বত্রিশ হাজার একাশি। তন্মধ্যে জারজ আটাশ হাজার ছিয়াশি। অর্থাৎ "ইংল্যাণ্ডের প্রতি ২২টী শিশুর মধ্যে ১৯৩০ সালে একটী শিশু নামহীন গোত্রহীন হইয়া জন্মলাভ করিয়া 'টমি-কুল' সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। অথবা আরও সংক্ষিপ্ত হিসাবে ঐ বছরে প্রতিদিন ইংল্যাণ্ডের ৭৭টী শ্বেতকন্যা অবৈধ উপায়ে সন্তানের জননী হইয়াছে।"

আমরা এইরূপ হিসাব আরও দিতে পারি, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপকে গালাগালি দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সকল ব্যাপারে পাশ্চাত্যকে নির্বিচারে নকল করিতে গেলে আমরা যে নিশ্চিত ঠকিব, তাহা বুঝানই উদ্দেশ্য।

পিতার পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়া পিতৃপরিচয়-জিজ্ঞাসা-টাকে একটা সামাজিক অসভ্রম বলিয়া মনে করিতেছে, ইহা কি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গৌরবদান করিতেছে? সমাজ-সংস্কারের কুহকে পড়িয়া, স্বাধীনতার মায়া-মরীচিকায় ভুলিয়া ভারতবর্ষও কি তাহার ভবিষ্যৎ পুত্রকন্যাগণকে পিতৃ-পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা ও গৌরব-টুকু হইতে বঞ্চিত করিবে? আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, পারস্পরিক অধীনতাকে অস্বীকার করিয়া ভারত কখনও দাম্পত্য জীবনে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার মরণবুদ্ধি করিবে না। ভারতের নারী যেমন এদিকে পুরুষের আদেশ, অনুজ্ঞা বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই স্বামীর ও দেশের কল্যাণের জন্য স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় খর্ব্ব করিবেন, ভারতের পুরুষও তেমনি নারীর প্রার্থনা, মিনতি বা কাতরতার অপেক্ষা না করিয়াই পত্নীর ও দেশের মঙ্গলার্থে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত করিয়া লইবেন। মনে রাখিতে হইবে, **দম্পতীর স্বাধীনতার স্পৃহা যতই অধিক হউক, যে দেশে বিবাহ একটা অধ্যাত্ম-সাধনা, সে দেশের বিবাহে বিচ্ছেদ থাকিতে পারে না।** সদ্‌গুরুর অভাব বশতঃ আধ্যাত্মিক সাধনারূপে বিবাহের মর্য্যাদা আমরা তেমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতে না পারিলেও, আধ্যাত্মিক সাধনারূপে বিবাহিত জীবনকে গ্রহণ ও গৃহীত করিবার চেষ্টা যে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী করিয়া আসিতেছি, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদিনেও বিবাহিত জীবন আধ্যাত্মিক সাধনার জীবনরূপে গৃহীত হইল না বলিয়া আমরা লজ্জিত হইতে পারি, কিন্তু কস্মিন্ কালেই যে হইবে না, এমন হতাশা পোষণ করিতে পারি না। বরঞ্চ ভরসা পাইবার এবং আশা পোষণ করিবারই যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের মধ্যে

পাশ্চাত্য সমাজ ও পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা

বিবাহ-বিচ্ছেদ

অকল্পনীয়ঃ যে পুরুষ পরিণীতা পত্নীকে ত্যাগ করে, আমরা তাহাকে পশু বলি, মানুষ বলি না। এদেশের স্ত্রী এখনও স্বামীকে ত্যাগ করিতে শিখে নাই বলিয়া তাহাকে আমরা নির্ব্বোধ বলি না, দেবী বলি। এমন দিন অবশ্য আসিবে, যেদিন পত্নী অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বন্ধ্যা বা রুগ্না, একথার যত বিচার বিবাহের পূর্ব্বেই হইয়া যাইবে, পরন্তু এই সকল ত্রুটীর জন্য বিবাহিতা পত্নীকে কেহ পরিত্যাগ করিবে না। এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যেদিন লোকমতের ভয়ে নহে, রাজ-শাসনেরও ভয়ে নহে, পরন্তু একমাত্র বিবেকের তাড়নায়ই পুরুষেরা পত্নী-ত্যাগে পরাঙ্মুখ হইবে। এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যেদিন নরনারী উভয়েই বুঝিবে যে, ভারতীয় বিবাহ শুধু নরনারী-প্রেমেরই সাধক নহে, ভগবৎপ্রেম এবং বিশ্ব-প্রেমেরও সাধক।

(এও) পারস্পরিক শক্তিসাম্য-বিধায়িনী শত শত সাধন-প্রণালী জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং আছে। মুসলমানেরা যে বহুলোক একত্রে নামাজ পড়েন, খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রাহ্মেরা

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আধ্যাত্মিক শক্তিসাম্য

যে রবি-বাসরীয় ভজনাগারে সমবেত প্রার্থনা করেন, বৈষ্ণবেরা যে সম্মিলিত ভাবে কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, তাহার পশ্চাতে শক্তি-সাম্যের কল্পনা থাকুক আর না থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে কিন্তু শক্তি-সাম্যই হইয়া থাকে। সকলেরই মন যখন একটী ভাবের মধ্য দিয়া প্রশান্ত হইবার চেষ্টা করে, তখন তন্মধ্য হইতে বিশেষ একটী শক্তিশালী মনের প্রেরণা ও প্রভাব অপরাপরের মনের দৈন্যকে দূরীভূত করে, সকলেরই

অন্তরের উৎসগুলি যেন নিমেষে খুলিয়া দেয়। ইহাই শক্তিসাম্য।

শক্তিসাম্যের মর্ম্মকথা

উন্নতির পথে যাঁহারা অগ্রচারী, তাঁহারা ইহাদ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হন না, অথচ যাঁহারা তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাঁহারা অগ্রগামীদের ভাবের গভীরতায় প্রভাবিত হইয়া নিজেদের নানা অসম্পূর্ণতার পরিবন্ধন হইতে মুক্ত হন। এই জন্যই, যাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আছে, এমন সাধকেরা একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের প্রত্যেকের ধর্ম্মসংস্কারের অবিরোধী একটী সাধন-প্রণালী অবলম্বনে চক্রে বসিয়া থাকেন। প্রত্যেকের মন যখন সাধনে একাগ্র হয়, তখন যাঁহার যে শ্রেষ্ঠতা থাকে, তাহা সকলের অজ্ঞাতসারে অপর প্রত্যেকের মধ্যে অল্পাধিক সঞ্চারিত হয়। একই ব্যক্তিবর্গ বহুদিন পর্য্যন্ত সমান আগ্রহ লইয়া সম্মিলিত-ভাবে এইরূপ সাধন করিতে থাকিলে পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা পরস্পরের মধ্যে চিরস্থায়ী রূপে সংক্রামিত হইয়া থাকে। তান্ত্রিক ও তন্ত্র-প্রভাবিত বৈষ্ণব সাধকেরা এই তত্ত্বটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াই

তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদের শক্তিসাম্য

ভৈরবী চক্র, যোগিনী চক্র, পাঞ্চতাত্ত্বিক শক্তিসাধন, কিশোরী-ভজন প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের বহুজন-সম্মিলিত স্ত্রীপুরুষ-সংশ্লিষ্ট সাধন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সাধন-প্রণালী অনেক সময়ে একটী সত্যকে সমাদর করিতে গিয়া বহু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, একটী তত্ত্বকে অভ্যাস করিতে যাইয়া বহু ভ্রান্তিতে

উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট শক্তিসাম্য-প্রয়াসের কদর্য্যতা

বিলসিত হইয়াছে, একটী মঙ্গলকে লাভ করিতে চাহিয়া বহু অমঙ্গলকে আমন্ত্রিত করিয়াছে এবং এইভাবে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, প্রচ্ছন্ন জীবনটীকে ধর্ম্ম-সাধনার নামে অশ্লীল অতিচার ও অনাচারে

পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে। এই হেতুতেই স্থূল ও নিকৃষ্ট প্রণালীসমূহ ভারতবর্ষীয় সাধন-জীবন হইতে ধীরে ধীরে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে কোন্ প্রণালীতে স্বামী ও পত্নীর আধ্যাত্মিক শক্তি-সাম্য সর্ব্বপ্রকারে সুখাবহ হইবে, আমরা শ্রেষ্ঠতার ক্রমিকতা অনুসারে নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। এই স্থলে একটী বিশেষ আবশ্যকীয় কথা মনে রাখিতে হইবে যে, **নিম্নোক্ত যে প্রণালী ধরিয়াই শক্তি-সাম্য করা হউক না কেন, সাধনকালে একে অন্যের দেহ স্পর্শ করিতে পারিবেন না।**

দাম্পত্য শক্তিসাম্যের কতিপয় প্রণালী

(১) স্বামী ও স্ত্রী একই আসনে অথবা দুইটী পৃথক্ আসনে পাশাপাশি বসিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া নিজ নিজ ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট উপাসনা করিবেন। একের প্রতি অন্যের লক্ষ্য বা মন না থাকিলেও ইহাদ্বারাই শক্তি-সাম্য ঘটিবে। কিন্তু ইহা অতি প্রাথমিক উপায়।

(২) স্বামী ও স্ত্রী একই আসনে বা পৃথক্ আসনে পাশাপাশি না বসিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরস্পর মুখামুখীভাবে বসিয়া প্রথম প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। ইহা প্রথমোক্ত উপায় অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা প্রথমটী অভ্যাস না করিয়া দ্বিতীয়টী করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা প্রথমটী নিয়মিত অভ্যাসের পর দ্বিতীয়টী ধরিয়াছেন, তাঁহারা অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

(৩) উন্মীলিত নেত্রে প্রশান্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের ভ্রূমধ্যে চাহিয়া স্বামী স্ত্রীর মুখমণ্ডলে নিজ মূর্ত্তি * এবং স্ত্রী স্বামীর মুখমণ্ডলে নিজ মূর্ত্তির চিন্তা করিবেন। মন যাহা ভাবে, দৃষ্টিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই দেখিতে পায়। ক্রমিক অভ্যাসের গুণে একের মুখে অপরের মূর্ত্তি দর্শন নিতান্তই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় স্বামীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখখানাই এবং স্ত্রীর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখখানাই অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে মনে হইতে থাকে যেন, দৃষ্ট মুখখানাই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অস্তিত্বশীল পদার্থ, গৃহমধ্যস্থ অপরাপর বস্তু এবং মুখের মালিকের অপরাপর অঙ্গ যেন নাই। তৎপরে স্ত্রীর মুখমণ্ডলে স্বামীর মূর্ত্তির এবং স্বামীর মুখমণ্ডলে স্ত্রীর মূর্ত্তির একটা প্রতিবিম্ব যেন ফুটিয়া ওঠে। এই সময়ে একই মূর্ত্তিতে দুইটি রূপ যুগপৎ দেখা যায়। ধীরে ধীরে নিবিষ্টতা আরও বর্দ্ধিত হইলে দৃষ্টের মুখমণ্ডলে আর নিজ ছবিটী থাকেনা, দ্রষ্টারই মুখমণ্ডল তাহার সহযোগীর মুখমণ্ডলের স্থলে দৃষ্ট হয়।

যেখানে স্বামি-পত্নীর মধ্যে সাত্ত্বিক অনুরাগ সৃষ্ট হয় নাই এবং দৈহিক অসংযম সাধ্যমত সঙ্কুচিত হয় নাই, সেখানে প্রথমতঃ উভয়কে একই দেবতার অথবা একই মহাপুরুষের মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত ভাবে দর্শনের চেষ্টা কিছুদিন চালাইয়া তারপরে নিজ মূর্ত্তি দর্শনের অভ্যাস করিতে হয়।

---

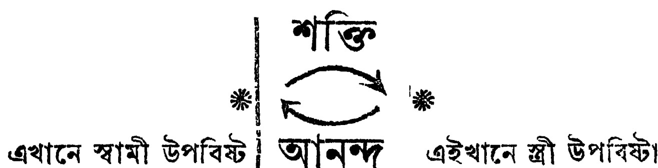
* মূর্ত্তি বলিতে এখানে মুখমণ্ডল বুঝাইতেছে।

(৪) পরস্পর পাশাপাশি একাসনে বা পৃথক্ আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিবেন, যেন, নিজ দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহযোগীর ঠিক সেই সেই অঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছে। এইভাবে ধ্যান করিতে করিতে যখন ধারণা জন্মিবে যে, দুই দেহ দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে বা পৃথক্ আসনস্থিতও নহে, তখন স্বামী বামাবর্ত্তে এবং স্ত্রী দক্ষিণাবর্ত্তে বিধি-অনুযায়ী জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চালক পরিভ্রমণ করিতে থাকিবেন। 'পরিভ্রমণ' ব্যাপারটা নিম্নে নবম প্রণালীতে লিখিত হইল।

(৫) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের মুখামুখী উপবেশন করিয়া পূরকে পূরক, রেচকে রেচক মিলাইয়া বিশিষ্টায়াম নামক প্রাণায়াম করিতে করিতে নামজপ করিবেন। দম্পতীর দৈনন্দিন অজপা-সংখ্যার তারতম্য-হেতু প্রথম সময়ে শ্বাসে শ্বাস মিলাইতে গেলে প্রাণবায়ুর উপরে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে। এই সকল স্থলে শক্তি-সাম্যের অভ্যাসের কাল প্রথম সময়ে খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক, নতুবা হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। পরে অভ্যাসের গুণে উভয়ের অজপার পার্থক্য আংশিকরূপে দূরীভূত হইলে দীর্ঘকাল অভ্যাস চলিতে পারে।

(৬) শ্রীনামী স্বামী প্রত্যাগিনী প্রণালীতে এবং শ্রীনামী পত্নী প্রগ্রাহিণী প্রণালীতে দ্বাদশাক্ষর ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে পরস্পরের ভ্রূমধ্যে চাহিয়া স্বামী পত্নীকে তাহার

সকল শক্তির উৎস-স্বরূপ এবং পত্নী স্বামীকে তাঁহার সকল আনন্দের আকর-স্বরূপ ভাবিতে থাকিবেন। এইরূপ শক্তি-সাম্যে সহজায়াম নামক প্রাণায়াম আবশ্যক হয়। স্বামি-পত্নীর সম্মিলিত চেষ্টায় শক্তিসাম্য করিতে উল্লিখিত সকল প্রণালীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতকল্যাণ-সাধক এবং চিরস্থায়ী ফলদায়ক।



প্রত্যাগিনী প্রগ্রাহিনী

(তারকাচিহ্নিত স্থানে সাধকদের ভ্রূমধ্য)

এই প্রণালীর শক্তিসাম্যের আবার তিনটী বিশেষ ভঙ্গী আছে। যথা, স্বপ্রধান, পরপ্রধান এবং অপ্রধান। স্বামী যখন নিজেকে পরমানন্দস্বরূপ এবং পত্নী যখন নিজেকে আদ্যাশক্তিস্বরূপ জ্ঞান করেন, তখন শক্তিসাম্য **স্বপ্রধান।** স্বামী যখন পত্নীকে আদ্যাশক্তি স্বরূপ এবং পত্নী যখন স্বামীকে পরমানন্দস্বরূপ জ্ঞান করেন, তখন শক্তিসাম্য **পরপ্রধান।** স্বামী যখন একই সঙ্গে নিজেকে পরমানন্দস্বরূপ এবং পত্নীকে আদ্যাশক্তিস্বরূপ জ্ঞান করেন, আবার পত্নী যখন একই সঙ্গে নিজেকে আদ্যাশক্তিস্বরূপ এবং স্বামীকে পরমানন্দ-

স্বপ্রধান, পরপ্রধান ও অপ্রধান শক্তিসাম্য

স্বরূপ জ্ঞান করেন, তখন শক্তিসাম্য **অপ্রধান**। স্বপ্রধান ভঙ্গীটুকু অপেক্ষা পরপ্রধান ভঙ্গী শ্রেষ্ঠ, পরপ্রধান অপেক্ষা অপ্রধান শ্রেষ্ঠ। স্বপ্রধান অভ্যস্ত হইলে পরপ্রধান এবং পরপ্রধান অভ্যস্ত হইলে অপ্রধান অভ্যাস করিতে হয়। অপ্রধান-অভ্যাসকারীর পক্ষে আর কোনও উৎকৃষ্টতর প্রণালী নাই। যে স্থলে স্বামী ও পত্নী বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিতেছেন, সেইখানেও জীবন-সঙ্গিনী বা জীবন-সঙ্গীকে কল্পনায় সম্মুখীন জানিয়া এইরূপ শক্তিসাম্য চলিতে পারে।

প্রত্যাগিনী
ও
প্রগ্রাহিণী

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যাগিনী ও প্রগ্রাহিণী দুইটী পারিভাষিক শব্দ (Technical Terms)। দাম্পত্য সাধনার সৌকর্য্যার্থে একটী সুগভীর সুপ্রচ্ছন্ন তত্ত্বকে এই দুইটী পারিভাষিক শব্দের দ্বারা অতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যাহাকে দিয়া যাহার প্রকাশ, সে তাহার শক্তি, যাহাকে দিয়া যাহার প্রশান্তি, সে তাহার আনন্দ। পত্নীকে দিয়া স্বামীর প্রকাশ, অর্থাৎ পত্নীর মধ্যবর্ত্তিতায় স্বামী নিজেকে প্রসারিত করিতেছে, তাহার বহির্ম্মুখ কর্ম্ম-প্রয়াস পত্নীর সাত্ত্বিকী প্রেরণা হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, অতএব নারী মহাশক্তি। স্বামীকে দিয়া পত্নীর প্রশান্তি অর্থাৎ এখানে আসিয়া তাহার সকল বহির্ম্মুখ কর্ম্মচাঞ্চল্য ও চিন্তাতারল্য ঘনীভূত হইয়া সুনিবিড় প্রশান্তি-স্নিগ্ধ আনন্দে পরিণত হইতেছে, অতএব পুরুষ পরমানন্দ। নারী কর্ম্মশক্তির কেন্দ্র, পুরুষ কর্ম্মচেষ্টার বিগ্রহ। নারী তাঁহার উদ্বোধিনী প্রেরণার বলে পুরুষের পরমা শক্তি, পুরুষ তাঁহার কর্ম্মপরায়ণ পৌরুষের বলে নারীর আনন্দ-কন্দ। পুরুষ নারীকে মহাশক্তি জানিয়া তাঁহার জন্য ত্যাগ করিতেছেন, ইহাই **প্রত্যাগিনী**। নারী

পুরুষকে পরমানন্দ জানিয়া তাঁহারই জন্য গ্রহণ করিতেছেন, ইহাই **প্রগ্রাহিনী**। গ্রহণে ত্যাগে, জীবনে মরণে, নিত্যসম্বন্ধ। পুরুষ যখন নিজেকে বলি দিতেছেন, নারী তখন বিশ্ব প্রসব করিতেছেন। পুরুষ প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিয়াই কৃতার্থ, নারী প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ ; একজন প্রতি প্রশ্বাসে মরিয়া কৃতার্থ, আর একজন প্রতিশ্বাসে জীবনকে স্বীকার করিয়া জীবনকে শতমুখে প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ। একজন সম্যক্ ত্যাগী, একজন সম্যক্ গ্রাহী এবং উভয়ে মিলিয়া গ্রহণ ও ত্যাগের অতীত পরমসত্তা।

(৭) পঞ্চম প্রণালীর সহিত ষষ্ঠ প্রণালীর সামঞ্জস্য করিয়া অর্থাৎ ষষ্ঠ প্রণালীর কথিত উপদেশ পালন করতঃ তৎসহ শ্বাসপ্রশ্বাসের রেচকে রেচক ও পূরকে পূরক মিলাইয়াও শক্তিসাম্য হয়। কিন্তু পঞ্চম প্রণালী অভ্যাস করিয়া তৎপরে যাহারা ষষ্ঠ প্রণালী ধরেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কষ্টসাধ্য মিশ্র-চেষ্টা করিতে হয় না।

(৮) পূরকে রেচক ও রেচকে পূরক মিলাইয়া পঞ্চম প্রণালীর অভ্যাসেও শক্তিসাম্য হয়। যেস্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে বর্গ নাই, সেস্থলে এই প্রণালী অবলম্বনীয়। তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের কলহ-প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। ইহাতে শক্তিসাম্য পঞ্চম প্রণালীর সমানই হয়। যেস্থলে স্বামী ও পত্নীতে বর্গ আছে, সেখানেও ইহা অভ্যাস করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা তত প্রয়োজনীয় নহে।

(৯) আরও একপ্রকার শক্তিসাম্য আছে, যাহা ষষ্ঠ প্রণালী অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট না হইলেও কোন কোন স্থলে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে স্বামী-পত্নীর পরস্পরের সান্নিধ্য আবশ্যক হয় না। জগতের মঙ্গল-সঙ্কল্প পূর্ব্বক দেহমধ্যে শক্তি-সঞ্চালক পরিভ্রমণ করিবার কালে স্বামী যদি নিজ দেহকে পত্নীর দেহ বলিয়া এবং পত্নী যদি নিজ দেহকে স্বামীর দেহ বলিয়া ধ্যান করেন এবং পরস্পরের দেহ রূপান্তরিত জানিয়া বিপরীত-ক্রমে অগ্রসর হন, তাহা হইলে এইরূপ শক্তিসাম্য সাধিত হয়।

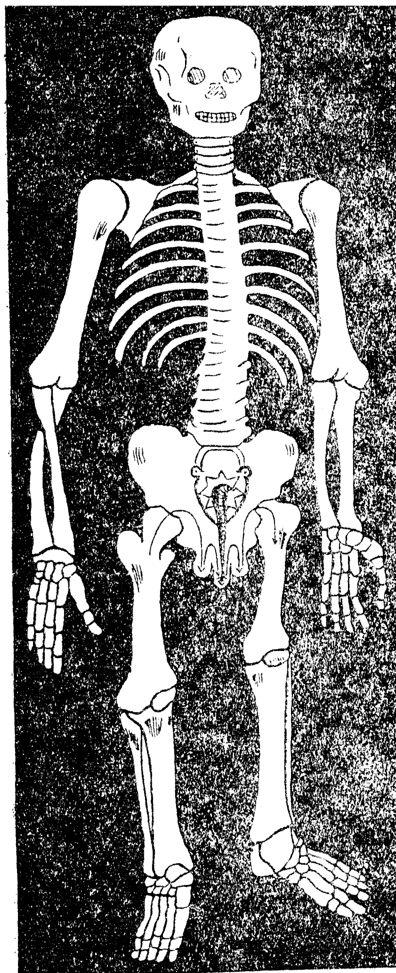
স্ত্রীস্বামীর পরিভ্রমণ

পরিভ্রমণের অ-বিপরীত ক্রমঃ—

(পুরুষের পক্ষে) একুশবার অশ্বিনী মুদ্রা বা যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিয়া লিঙ্গমূলে (স্বাধিষ্ঠানে), তৎপর ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রে, লিঙ্গমূল হইয়া বাম অণ্ডকোষে, বামপদে, পাদনখাগ্রগুলি হইয়া কোমর হইয়া মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধের উপর দিয়া বামহস্তে ও অঙ্গুলীসমূহের শেষ সীমায় (সর্ব্বদাই অঙ্গুষ্ঠা প্রথমে, তর্জ্জনী তৎপর এবং এই ভাবে সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠা) তৎপরে স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক হইতে একটু বেশী সময় থাকিয়া থাকিয়া তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া দক্ষিণহস্তে, তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া দক্ষিণপদে, দক্ষিণ অণ্ডকোষে এবং পুনরায় লিঙ্গমূলে

পুরুষের পরিভ্রমণ

(নারীর পক্ষে) একুশবার অশ্বিনী মুদ্রা বা যোনি মুদ্রা অভ্যাস করিয়া যোনি, জরায়ু, বামডিম্বাধার, দক্ষিণ ডিম্বাধার,



শ্রীনামীর পরিভ্রমণ

(পুরুষের পক্ষে)

পুনরায় জরায়ু ও যোনি হইয়া দক্ষিণপদ, পদনখাগ্রগুলি হইয়া কোমর হইয়া মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্ত, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে ও অঙ্গুলী-সমূহের শেষ সীমায় (সর্ব্বদাই অঙ্গুষ্ঠা প্রথমে), তৎপর স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া মস্তিষ্কে একটু বেশী সময় থাকিয়া থাকিয়া তিনবার অথবা বারংবার পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া বামহস্তে, তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া বামপদে এবং জননেন্দ্রিয়ে।

রমণীর পরিভ্রমণ

নবম প্রণালীটি ব্যতীত অপর সকলগুলি প্রণালী স্বামিপত্নীর ব্যতিরিক্ত গুরুশিষ্যে, দুই গুরুভ্রাতায়, দুই গুরু-ভগ্নীতে, বিভিন্ন গুরুর একই সাধনধর্ম্মাবলম্বী শিষ্যদ্বয়ে প্রয়োজন বুঝিয়া না চলিতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু পুরুষ-গুরু ও স্ত্রী-শিষ্যের মধ্যে, স্ত্রীগুরু ও পুরুষ-শিষ্যের মধ্যে, গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীর মধ্যে নিষিদ্ধ। ষষ্ঠ প্রণালী এই সব স্থলে অভ্যাস করিতে হইলে পর্য্যায়ক্রমে উভয়কে একদিন প্রগ্রাহিণী ও পরদিন প্রত্যাগিনী করিতে হইবে।

শক্তি-সাম্যের পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি আবশ্যক মত অভ্যস্ত হইয়া গেলে অথবা দাম্পত্য সাধক-সাধিকার ভিতরে উপযুক্ততা অনুভূত হইলে **পরস্পরের দেহস্পর্শমূলক অথচ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা-বিরহিত নিম্নলিখিত প্রণালীগুলিও স্থলবিশেষে অনুসৃত হইতে পারে।**

(১০) দ্বিতীয় প্রণালীর অভ্যাসকালে স্বামীর উত্তান-ভাবে রক্ষিত করতল-দ্বয়ের উপরে স্ত্রী তাঁহার করতল-দ্বয়ও

উত্তানভাবে রাখিবেন। দ্বিতীয় প্রণালী-মতে যাঁহারা উন্নতির পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই প্রণালীর দ্বারা অধিকতর ফললাভ করিবেন।

(১১) তৃতীয় প্রণালীর অভ্যাসকালে স্বামীর উত্তান-ভাবে রক্ষিত করতলদ্বয়ের উপরে স্ত্রী তাহার করতলদ্বয়ও উত্তানভাবে রাখিবেন। ইহা তৃতীয় প্রণালীর অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

(১২) করে কর রাখিয়া পঞ্চম প্রণালী অভ্যাস করিতে হইবে। যাহার করতল যখন নিম্নে থাকিবে, তিনি তখন শ্বাসগ্রহণ বুঝাইতে অপরের করকেন্দ্রে এবং প্রশ্বাস-ত্যাগ বুঝাইতে অপরের অঙ্গুষ্ঠমূলে নিজ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মৃদু চাপ দিয়া ইঙ্গিত করিবেন। ইহা পঞ্চম প্রণালী অপেক্ষা ফলপ্রদ।

(১৩) করে কর রাখিয়া ষষ্ঠপ্রণালী অভ্যাস করিতে হইবে এবং দ্বাদশ প্রণালীতে কথিত কৌশলে শ্বাস-প্রশ্বাস মিলাইতে হইবে।

(১৪) "সহজায়াম" প্রাণায়ামে দীক্ষাপ্রাপ্তনামের একাক্ষর বীজ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে করে করতল রাখিয়া ভ্রূমধ্য-সেবী মুদ্রিত নয়নে স্বয়ংস্ফূর্ত্ত দিব্য-রূপের প্রতীক্ষা করত দ্বাদশ প্রণালীতে কথিত কৌশলে শ্বাস, প্রশ্বাস, আভ্যন্তর বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি মিলাইয়া ক্রিয়া করিতে হইবে। কথিত আছে, শক্তি-সাম্যের প্রণালী-সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরাকাষ্ঠা।

উল্লিখিত দেহ-স্পর্শমূলক **শক্তিসাম্যের অভ্যাস-কালে** যদি দৈবাৎ **কামোত্তেজনা** উদ্দীপ্ত হয়, তাহা হইলে শক্তি-সাম্যের নিম্নলিখিত প্রণালীগুলি অভ্যাসে অভাবনীয় ফলোদয় ঘটিবে।

(১৫) করে করতল সংন্যস্ত করিয়া পরস্পরের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিল রাখিয়া গুহ্যদেশ অকুঞ্চন করিবার কালে শ্বাস-গ্রহণ ও আকুঞ্চন পরিহার করিবার কালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্বিনীমুদ্রার অভ্যাস করিতে হইবে।

(১৬) করে করতল সংন্যস্ত করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসে মিল রাখিয়া উপস্থ আকর্ষণকালে শ্বাস-গ্রহণ ও আকুঞ্চন-পরিহার-কালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ধিনী-মুদ্রার অভ্যাস করিতে হইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধানতার আবশ্যকতা এই যে, অশ্বিনী-মুদ্রা অভ্যাসের অব্যবহিত পর ব্যতীত কখনও সন্ধিনী-মুদ্রা করা কর্ত্তব্য নহে।

(১৭) স্বামী ও স্ত্রী সকল বিষয়ই পঞ্চদশ ও ষোড়শ প্রণালীর মত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে অশ্বিনী ও সন্ধিনী মুদ্রা অভ্যাস করিতে থাকিবেন।

পূর্ব্বোক্ত দশম হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যক দেহ-স্পর্শ-মূলক শক্তিসাম্যে যাহাদের কামোত্তেজনা ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহারাও পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ-সংখ্যক প্রণালীর অভ্যাসের দ্বারা বিশেষ-ভাবে লাভবান্ হইবেন, যেহেতু এই প্রণালী-ত্রয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযমের সামর্থ্য ও কামদমনের শক্তি অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হয়।

সকল প্রণালীর চূড়াস্বরূপ এবং একমাত্র শ্রেষ্ঠ অধিকারীরই জন্য ব্যবস্থাপিত আরও দুইটী দাম্পত্য শক্তিসাম্যের প্রণালী আছে, যাহা

এই গ্রন্থে উল্লেখ করা মাত্র সমীচিন মনে করি। উহাদের একটীর নাম "কন্যকা-প্রণালী", অপরটীর নাম "শৃঙ্গারী-প্রণালী"। উভয়ই ইন্দ্রিয় চেষ্টাহীন এবং সংযমানুমোদিত। কিন্তু যথাতথা প্রচার অনাবশ্যক বোধ করিয়া বিস্তারিত বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম।

শক্তিসাম্যের কন্যকা প্রণালী

শৃঙ্গারী প্রণালী

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল ও রাত্রি,—এই চারিটীই শক্তিসাম্যের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়।

শক্তি-সাম্যের প্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, অথচ শক্তিসাম্যেরই বিশেষ সহায়তা করে, এমন আর একটী বিষয়ের এস্থানে অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিষয়টী **বিপরীত রমণ।** "বিপরীত রমণ" কথাটী তান্ত্রিক সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহে কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ তথাকথিত তান্ত্রিকেরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন বলিয়াই আচার দৃষ্টে মনে হয়। বিপরীত রমণ ব্যাপারটা দৈহিক রমণ নহে, ইহাতে দেহের রমণ-সুলভ নগ্নতা ও আন্দোলনাদি নাই, ইহা মূলতঃ মনেরই ব্যাপার, ইহা আত্মিক রমণ বা সূক্ষ্ম রমণ। সাধারণ রমণের সহিত সুখাস্বাদন-বিষয়ে ইহার সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রক্রিয়া-বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। রমণ-লালসা স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার একটা অপরিহার্য্য রূপ, অথচ নিজ-সুখেচ্ছা এখানে প্রবল বলিয়া প্রকৃত সুখলাভ ইহার দ্বারা হয় না। প্রিয়জনের সুখসম্পাদনই যেখানে লক্ষ্য, সুখ আসে সেখানে। "বিপরীত রমণ" মানে

বিপরীত রমণ মনেরই ব্যাপার

সাধারণ রমণের সহিত বিপরীত রমণের পার্থক্য

সাধারণ রমণের উল্টা ব্যাপার। সাধারণ রমণে আত্মসুখেচ্ছা প্রধান, বিপরীত রমণে পর-সুখেচ্ছা প্রধান। পরসুখেচ্ছা যেখানে আত্যন্তিক-রূপে প্রবল এবং আত্মসুখেচ্ছা একেবারেই মৃত, সেখানে ব্যাপারটা ত' দেহের অতীত নিশ্চয়ই হইবে। আত্মসুখ সম্পাদনের কামনা যেখানে ছিন্নমূল এবং পরসুখকামনাই যেখানে একমাত্র প্রেরয়িত্রী, সেখানে বাহ্য ইন্দ্রিয়-চেষ্টা আপনিই থমকিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বিপরীত

বিপরীত রমণে আত্মসুখেচ্ছা অপ্রবল

রমণ ব্যাপারটা কিছুতেই দৈহিক রমণ নয়। "বিপরীত রমণ" কথাটার মানে এই নহে যে, স্বামী ও স্ত্রী দেহ দ্বারা রমণকার্য্য পরিচালিত করিবে এবং তৎকালে পুরুষ নারীবৎ রহিবে, নারী পুরুষবৎ হইবে। কিন্তু বিপরীত রমণের এইরূপ কদর্থ করিয়া অনেকে ধর্ম্মের নামে তাহা প্রচলনের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সমাজের অনিষ্ট সাধিয়াছেন। অথচ ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, দেহকে নিঃস্পন্দিত রাখিয়া অনগ্ন আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী পার্শ্ব-শয়িত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে বিপরীত-লিঙ্গী বলিয়া ভাবনা করিতে

বিপরীত রমণের বৈশিষ্ট্য

করিতে নিদ্রাগত হইবে। বিপরীত রমণে স্বামী নিজেকে স্ত্রী বলিয়া এবং স্ত্রী নিজেকে স্বামী বলিয়া কল্পনা করিবে, সমগ্র দেহের এবং নিখিল ইন্দ্রিয়-গ্রামের লিঙ্গান্তর-প্রাপ্তি ধ্যান করিবে, কেশকলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া চরণনখর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরটার স্ত্রীভাবপ্রাপ্তি ও পুরুষভাব-প্রাপ্তির ধ্যান করিবে। এই ধ্যানটাকে জমাইয়া তোলাই বিপরীত রমণের আসল বিশিষ্টতা। স্বকীয় ইন্দ্রিয় নিচয়ের বিপরীত পরিবর্ত্তন চিন্তনই বিপরীত রমণের মূল কথা। গৃহী সাধকেরা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য নিবারণকল্পে এই বিপরীত রমণের

শক্তি অতীব আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিসাম্যের যাবতীয় প্রণালীর সহিত বিপরীত রমণের এক বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। স্বামিস্ত্রীর পারস্পরিক অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা উভয়েরই লক্ষ্য, স্বামিস্ত্রীর বিভিন্নমুখিনী মনোগতিকে একমুখিনী করা উভয়েরই প্রত্যক্ষ ফল, কিন্তু "শক্তিসাম্যে" স্বামিস্ত্রীর নিজ নিজ জননেন্দ্রিয়ে চিত্তের কোনও অভিনিবেশ নাই, বিপরীত রমণে তাহা আছে। শক্তিসাম্যের কোনও কোনও প্রণালীতে স্বামীস্ত্রীকে পাশাপাশি একাসনে বসিয়া নাম জপ করিতে হয়, কোনও কোনও প্রণালীতে মুখামুখী বসিয়া পরস্পর ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিয়া একের মুখমণ্ডলে অপরের মুখমণ্ডল ধ্যান করিতে হয়, কোনও প্রণালীতে বা শ্বাসে শ্বাস ও প্রশ্বাসে প্রশ্বাস মিলাইয়া উপবিষ্ট ভাবে অফুরন্ত নাম জপ করিতে হয়, "কঞ্চুকা" ও "শৃঙ্গারী" প্রণালীর শক্তিসাম্যে ইহার চাইতেও অভিনব ব্যাপার রহিয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি জনন-যন্ত্রের চিন্তা নাই, সর্ব্বত্রই মনকে উর্দ্ধাঙ্গসেবী, বিশেষ ভাবে ভ্রূমধ্যসেবী, রাখিবারই ব্যবস্থা। কিন্তু বিপরীত রমণের তাহাই হইল প্রাণবস্তু। আবার, সাধারণ রমণে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে, ব্যবহার আছে, মৈথুনের উদ্যম আছে, মৈথুনধর্ম্মী নানা অঙ্গবিকার আছে কিন্তু বিপরীত রমণে তাহার কিছুই নাই। বিপরীত রমণে দেহের মিলন আছে কিন্তু সে মিলন সংযত ও সুরুচির অবিরোধী। ফলে, ইহাকে শক্তিসাম্যের এক চরম প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। বিপরীত রমণের স্থূল অবস্থা হইতেছে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়া কিন্তু তার পরমুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ হইল রমণের সূক্ষ্ম গতি। তখন ধ্যান জমাইয়া নিতে হইবে,—নিজ নিজ ইন্দ্রিয়গত রূপান্তরের। ধ্যান যখন জমিয়া উঠিল,

বিপরীত রমণ ও শক্তি-সাম্যের প্রভেদ

বিপরীত রমণের ক্রম

তখন আরম্ভ হইবে উভয়ের শ্বাস-প্রশ্বাস মিলাইয়া অফুরন্ত নাম জপ। নামজপ যখন জমিয়া উঠিল, প্রকৃত রমণ-সুখ তখন আপনি উন্মেষিত হইবে। একটী ইন্দ্রিয়ের রমণ নহে, প্রতি রোমকূপে তখন রমণ-সুখ আস্বাদিত হইতে থাকিবে। সম্ভোগ-লালসা হৃৎপিণ্ড চিবাইয়া খাইতেছে, কোনও যুক্তি-বিচার দিয়াই তাহাকে অপসারিত করা যাইতেছে না, কোনও বাধাই উদ্দাম প্রবৃত্তিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, এইরূপ পুরুষ ও নারীদের জন্যই তত্ত্বদর্শী যোগী বিপরীত রমণের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিতান্ত আধুনিক যুগেও বিপরীত রমণ সাধনের দ্বারা উৎকট কামুকতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন,—এমন ভাগ্যবান্ দম্পতীর সংখ্যা বড় অল্প নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অভ্যাসে অধিকারী, এমন কথা বলিতে পারি না। অত্যন্ত সবলচেতা ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা অনাবশ্যক, যেহেতু ইহা ব্যতীতই তাঁহারা কামজয়ী হইতে পারেন। অত্যন্ত দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিপজ্জনক, কারণ সৎসঙ্কল্পে দৃঢ়তার অভাবহেতু প্রার্থিত জনের সান্নিধ্যমাত্র সংযমের বাঁধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, মনকে ধ্যানমুখীন করিবার পূর্ব্বেই অবাধ্য পূর্ব্বসংস্কার দেহকে অবাঞ্ছনীয় অপকার্য্যে লিপ্ত করিতে পারে, উন্নতি লাভের লোভে ধাবিত হইয়া দুরন্ত অধোগতিও হইতে পারে। বিপরীত রমণ মধ্যচেতা পুরুষের পক্ষেই অবলম্বনীয় এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সংযমাগ্রহ যেখানে সমান তীব্র, সেখানেই ইহা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত অমৃতময় ফল প্রদান করিয়া থাকে।

বিপরীত রমণের নিষিদ্ধতা

শক্তিসাম্যের অনুকূল যে সকল প্রক্রিয়া গুপ্তভাবে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও কোনও কোনও মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে এখনও

চলিতেছে, তাহা অনেকস্থলে সাধকগণের ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিচার-পরায়ণতার অভাবে এবং গুপ্ততার সুযোগে নানা কুৎসিত কুরুচিতে ও কদর্য্য কদাচারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই সকল গুপ্ত সঙ্ঘ (Esoteric Organisation) লোক-সংগ্রহ কিরূপ অদ্ভূত কৌশলে ব্যাপকভাবে হইতেছে, সাধারণেরপক্ষে তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। সমাজে যাহারা ধর্ম্ম-শিক্ষক, সাধক এবং তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পরিচিত এইরূপ একশ্রেণীর লোকেরাই নানাবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা, যাহাদের কোনও প্রকার সামাজিক বন্ধন নাই, এমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইতে ভক্ত-সংগ্রহ করিয়া এক একটী সংগুপ্ত সঙ্ঘ গঠন করিতেছে। ধর্ম্মাদর্শ ও তত্ত্বের বিচার করিতে গেলে (Philosophy and Spiritual Principles) ইহাদের সহিত তর্কে জয়ী হওয়া বড় কঠিন কথা। কিন্তু ইহাদের আচার-(Practice)-সমূহ পুরুষের পরনারী সংসর্গ, নারীর পরপুরুষ-সংসর্গ এবং নারী ও পুরুষের বৃথা মৈথুনকে কখনও পরোক্ষে কখনও প্রত্যক্ষে কখনও উভয়ত সমর্থন করিতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়-জয়ের পন্থা পাইয়াছি ভাবিয়া, ধর্ম্ম-সাধনা করিতেছি ভাবিয়া, অকথ্য অনাচারে অসংখ্য ধর্ম্ম-পিপাসু গৃহী গোপনে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। দাম্পত্য জীবনে ইন্দ্রিয়-চেষ্টা-বিরহিত শক্তিসাম্যের বহুল প্রচলন হইলে, ধর্ম্ম-লাভার্থ ঐ সকল গুপ্ত ধর্ম্মসভার যোগদানের প্রলোভন যে হ্রস্বীভূত হইবেই, ইহাতে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ ভক্তিধর্ম্মে ভগবানের সহিত মানবের যে পরমমধুর উজ্জল প্রেমের কথা বর্ণিত আছে, বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তাহার স্ফূরণের অবকাশ

শক্তিসাম্যমূলক কুরুচিপূর্ণ কদাচার সমূহ

ধর্ম্মের ভাণে কদাচারের প্রসার

বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা অধিক ঘটিলে, পরকীয়া-প্রীতির দৃষ্টান্ত যে-সকল সামাজিক দুর্নীতি আনয়ন করিয়াছে, তাহার প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের অকৌলিন্য হ্রাস পাইবে। জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং পরমা পরিতৃপ্তির সহিত যোগ নাই বলিয়াই বিবাহিত জীবনের সম্মান লাভের যোগ্যতা কমিয়াছে এবং ইহারই বিপরীত কারণে সন্ন্যাস-সাধনা কৌলিন্য লাভ করিয়াছে। মোক্ষধর্ম্মের সহিত সংসার-ধর্ম্মের এই যে বিরাট বিচ্ছিন্নতা, তাহা দাম্পত্য শক্তিসাম্যের দ্বারা বিদূরিত হইবে।

দাম্পত্য শক্তিসাম্য ও মোক্ষধর্ম্মের সহিত সংসার-ধর্ম্মের মিলন

দৈনন্দিন জীবন

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে চিন্তাশীল সুধীবর্গ যে সকল সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, বিবাহিতেরা সেই সকল পাঠে নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম তালিকা রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লইও। যাহারা উৎকৃষ্টতর উপদেশ পাইতেছ না, তাহারা নিম্নলিখিত উপদেশ মত চলিবে। কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত এখানেও সকল বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না।

রাত্রি অন্ততঃ একঘণ্টা থাকিতে গাত্রোত্থান করিবে এবং প্রাতঃস্নান

অভ্যাস না থাকিলে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ, ব্যায়াম ও হস্ত-পদ-দন্ত মুখাদির পরিমার্জ্জন করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করতঃ পবিত্র চিত্তে উপাসনা করিতে বসিবে। ভগবানের নিকটে বহুবাক্যযোগে নানাবিধ প্রার্থনাদি করা অপেক্ষা তাঁহার কোনও একটী পবিত্র নাম জপ করা অধিকতর ফলদ। অবশ্য, এই বিষয়ে ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপরে আমি অত্যাচার করিতে চাহি না। প্রথমতঃ দুই একটী সুমধুর স্তোত্র পাঠ করিয়া তৎপর নাম জপ আরম্ভ করিলে মনঃসন্নিবেশ শীঘ্র হয়। স্তোত্র নির্ব্বাচন করিতে নিজের মনের গতি ও রুচি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। জপ করিতে প্রত্যহ একই নামের আশ্রয় লইবে। নিত্য নূতন নাম জপ করিলে নামের ভিতরের রসের আস্বাদন পাওয়া যায় না। একই নামকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন অবিচলিত নিষ্ঠায় অগ্রসর হইলে, ক্রমে নাম হইতে প্রেম ও আনন্দ উপজাত হয়, শক্তি ও ভক্তি জাগ্রত হয়, সংযম ও শান্তি প্রসূত হয়। স্বামী ও পত্নী উভয়ের একই নাম জপ করা বিশেষ হিতকর, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। যাহারা একই গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত, তাহারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত হইলে উভয়ের সাধনধর্ম্মের সামঞ্জস্য উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা করাইয়া তৎপর অগ্রসর হওয়াই সমীচীন। যাহারা দীক্ষিত নহ বা প্রাপ্ত দীক্ষায় বিশ্বাসী নহ অথবা দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক নহ, তাহারা মনোভিমতানুযায়ী একটী নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া জপ করিবে। যাহারা গায়ত্রী মন্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারা উহা জপ করিতে পার।

গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্য

নাম-জপ ও প্রেম

গায়ত্রী ব্রাহ্মণের মন্ত্র,—জাতি-ব্রাহ্মণ নহে, কর্ম্ম-ব্রাহ্মণের মন্ত্র। কুসংস্কার বশঃতই এইরূপ বিশ্বাস চলিয়া আসি-

তেছে যে, ব্রাহ্মণের বংশে না জন্মিলে এবং পুরুষ না হইলে গায়ত্রী উচ্চারণ নিষিদ্ধ। পরন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে যে-কেহ পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার ও কৃপা লাভ করিতে চাহে, যে-কেহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে চাহে, গায়ত্রী জপে তাহারই অধিকার আছে। হউক না সে চণ্ডালবংশীয়, হউক না সে পারিয়া বা পঞ্চম, হউক না সে বালক বা নারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না। অধিক কি, ছাগ-কুক্কুরাদি পশুকুলের যদি কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে গায়ত্রী মন্ত্রের উপর তাহাদেরও অধিকার আমাদের প্রত্যেকের মত সমান ভাবেই জন্মিত। বৈদিক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, যাহা-দিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালনে বা বেদ পাঠে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের ব্রহ্মগায়ত্রীতেও অধিকার ছিল। যজুর্বেদের ছাব্বিশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে "ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়চ স্বায় চারণায়চ" উল্লেখের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য, শূদ্র, ভৃত্য ও অরণ (অতিশূদ্র) প্রভৃতিকে চারি বেদের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। আপস্তম্ভ ধর্ম্ম-সূত্রেও শূদ্রের অথর্ব্ববেদ পাঠ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণকে নয়টী অগ্নি-ষ্টোম, ক্ষত্রিয়কে পঞ্চদশটী, বৈশ্যকে সপ্তদশটী ও শূদ্রকে একবিংশতিটী অগ্নিষ্টোম করিতে বলা হইয়াছে। যজ্ঞকালে বেদ-মন্ত্র পাঠ করিয়াই আহুতি দিতে হয়। বৈদিক কোষরূপ নিরুক্ত গ্রন্থের পূর্ব্বষ্টক অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ষ্টোমশব্দের অর্থ বেদমন্ত্র, অতএব শূদ্রের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারই প্রমাণিত হইতেছে। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে তৃতীয় অনুবাকে ত্রিশ হইতে চৌত্রিশ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি হইতেছেন

ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র

গায়ত্রীতে শূদ্রাদির অধিকার

কবষএলুষ,—যিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। গোভিল-গৃহ্য-সূত্রে নাপিতকে বেদ মন্ত্রে অধিকার দেওয়া হইয়াছে,—আজও বিবাহের কালে নাপিত যে গৌর-বচন বলে, তাহাও গোঃ গোঃ ইত্যাদি বেদ মন্ত্রেরই প্রথাগত ও পুরুষানুক্রমিক রূপান্তর মাত্র। আপস্তম্ভ-শ্রৌত-সূত্রে অতি-শূদ্র নিষাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা আছে। মহাভারত শান্তি পর্ব্বের তিনশত আটাশ অধ্যায়ে বেদব্যাস জৈমিনিকে উপদেশ দিতেছেন,—"তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণকে ক্রমশঃ বেদের উপদেশ করিবে, কারণ বেদাধ্যয়ন মনুষ্যের মুখ্য কর্ম্ম"। আপস্তম্ভ-সূত্রে দুষ্ট-কর্ম্ম-যুক্ত ব্রাহ্মণের উপনয়ন নিষেধ করা হইয়াছে এবং বেদের পারস্কর-গৃহ্য-সূত্রে দুষ্টকর্ম্মত্যাগী শূদ্রের উপনয়ন বিধান করা হইয়াছে। "শূদ্রা বাজসনেয়িনঃ" এবং "শূদ্রো বা চরিত-ব্রতঃ" ইত্যাদি বশিষ্ঠ ও গৌতমের প্রমাণের দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধিকার শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়। পুরাকালে চাণ্ডাল-কুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি বেদজ্ঞ ও চারিবর্ণের পূজাস্থানীয় হইয়াছিলেন। কবস ঋষি শূদ্র বংশীয় হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। নারদ ঋষি দাসী-গর্ভ-জাত হইয়াও বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে জাবাল ঋষি অজ্ঞাত কুলজাত হইয়াও বেদজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। সুতরাং বেদে বৈদিক মন্ত্রে এবং গায়ত্রীতে সকলেরই সমান অধিকার। তবে, গায়ত্রী মন্ত্রে সাকার রূপ কল্পনা নাই। এই জন্য সাকারোপাসকদের পক্ষে এই মন্ত্র যোগে মনঃসন্নিবেশন অতি দুরূহ ব্যাপার। সম্ভবতঃ এই জন্যই পরবর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যেরা ব্রহ্মগায়ত্রীর স্থলে সংক্ষিপ্ততর মন্ত্রসমূহ দর্শন করিয়া শিষ্যানুশিষ্যক্রমে তাহার উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই সকল মন্ত্রে রূপ-কল্পনা আছে, প্রত্যেকটী মন্ত্রের নিজস্ব এক একটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা প্রতীক আছে।

গায়ত্রী ও নিরাকার তত্ত্ব

সাধারণ সাধকেরা বিভিন্ন মূর্ত্তির প্রতি অনুরাগ হেতু সেই রূপটির প্রস্ফুটক নির্দ্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়া সাধন করিয়াছেন এবং এই ভাবেই বেদ-শাসিত ও বৌদ্ধনির্জ্জিত হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, রামায়ৎ বৈষ্ণব প্রভৃতি শত শত সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল অভিনব সম্প্রদায় বৌদ্ধদের মতন প্রকাশ্যে বেদবিরোধ করেন নাই, কিন্তু নিজ নিজ সাধকমণ্ডলের ভিতরে বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রচলনের চেষ্টা না করিয়া সাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের প্রচলনের চেষ্টা করার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের শাসনকে অমান্যই করিয়াছেন এবং বৈদিক পন্থার অনুসন্ধান না করিয়াও অপূর্ব্ব কল্যাণময় পন্থা আবিষ্কার করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই মনে হয়, এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন যে, 'চাল-কলা-খেকো' উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণেরা জোর করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রটাকে নিজেদের কোঁচার খুটে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কথাটা যেন সর্ব্বাংশে সত্য নয়। বরঞ্চ, ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, সাম্প্রদায়িক সংক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলির সাধনার মধ্যদিয়া ভারতবর্ষীয় অধিকসংখ্যক সাধক এমন লোভনীয় ব্রহ্মাস্বাদ পাইয়াছিলেন যে, গায়ত্রী মন্ত্রের অপরিহার্য্যতাকে তাঁহারা, মুখে না হউক, মনে মনে এবং কার্য্যতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন। নতুবা, এমন মনে হয় না যে, নানক, কবীর, তুকারাম, চৈতন্য প্রভৃতি শক্তি-শালী সম্প্রদায়-স্রষ্টারাও যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে নিজ নিজ সম্প্রদায়-মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ও উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে গায়ত্রীমন্ত্র চালাইতে পারিতেন না। আসল কথা হইতেছে, তাঁহারা গায়ত্রীর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই।

সাকার উপাসনা মূলক বীজমন্ত্র

অব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণেরাই কি গায়ত্রী-বঞ্চিত করিয়াছেন?

বিবাহিত নরনারীদের মধ্যে যাহারা গায়ত্রীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে না, অথবা উপলব্ধি করিলেও ইহাকে গৌণরূপেই গ্রহণ করিবে, তাহারা মুখ্যরূপে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে পারে। সাকার ব্রহ্মোপাসক "ওঁ হ্রী" "ওঁ ক্লীং" প্রভৃতি, নিরাকার ব্রহ্মোপাসক "ওঁ ব্রহ্ম", "ওঁ তৎসৎ", "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" প্রভৃতি, মুসলমান "বিস্মিল্লাহের্‌হমানের্‌হিম", "লাইলাহাইল্লাল্লাহ্, প্রভৃতি, খ্রীষ্টান "গড্ দি ফাদার; গড্ দি সন্" বা খ্রীষ্টনাম প্রভৃতি রুচি অনুযায়ী মন্ত্র জপ করিবে। যাহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারাও নিজ নিজ রুচিমত "সত্যং", "লোককল্যাণং", "পবিত্রতা" "অহং" প্রভৃতি কোনও একটী শব্দকে মন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া জপ করিবেন। অবশ্য, স্বয়ং-নির্ব্বাচিত মন্ত্রের সহিত দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রের সাধনফলে কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ, নাম-জপের স্থূল ও সূক্ষ্ম কৌশল-সমূহ আবিষ্কার করিয়া লইবার আশা সাধারণ লোকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন মন্ত্র

গভীর নিবিষ্ট ভাব না আসা পর্য্যন্ত নামজপ পরিত্যাগ করিবে না। জপ করিতে বসিয়া হয়ত কত বাজে কথা কত আজগুবী কল্পনা আসিবে, কখনও বা অবসাদ কখনও বা বিরক্তি জন্মিবে, কতবার অবিশ্বাস ও অনাস্থার উদ্রেক হইবে, কিন্তু তথাপি ছাড়িবে না। ইক্ষুদণ্ড, হইতে যেমন চিবাইয়া চিবাইয়া রস বাহির করিতে হয়, ভগবানের নাম হইতেও তেমন জপ করিতে করিতে রস নিষ্কাশন করিতে হইবে। নাম জপ করিতে চক্ষু নিমীলিত করিয়া লক্ষ্য ভ্রূমধ্যে রাখিতে পারিলেই ভাল। নামে বসিয়াই সঙ্কল্প করিবে যে, সম্যক্‌রূপে বাহ্যজ্ঞানহীন

কতক্ষণ নাম জপনীয়

হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত জপ ছাড়া হইবে না। জপে বসিয়া আলস্য বা তন্দ্রালুতা আসিলে কয়েকবার মহামুদ্রা অভ্যাস করিয়া পুনরায় জপে আত্মনিয়োগ করিবে। নাম জপ শেষ হইলে শক্তিসাম্যের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীসমূহ অবলম্বনীয়।

স্নান, উপাসনা ও শক্তিসাম্যের পূর্ব্বেই স্বামী ও পত্নীর উভয়ের পক্ষেই দৈহিক ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় নারীর পক্ষে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ মহামুদ্রার অভ্যাসই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কালক্রমে ব্যায়ামের পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। মহামুদ্রাদ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্য অতি সুন্দর রূপে রক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু আততায়ী-মর্দ্দনের জন্য নারীর দেহে যথেষ্ট শক্তিরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। **আদর্শ নারী একদিকে যেমন প্রেমের প্রতিমা হইবেন, আর একদিকে তেমনি নৃমুণ্ডমালিনী রণরঙ্গিণীও হইবেন।** নারীর মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পুরুষের অভিভাবকত্ব (!) যথেষ্ট নহে, তাঁহার নিজ বাহুতেও শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নারীর ব্যায়ামের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা কঠিন বলিয়াই যে চেষ্টা করিতেও হইবে না, তাহা নহে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবারে ছোটখাট রকমের চেষ্টা চলিতে থাকিলে কালক্রমে ইহা দেশব্যাপী হইতে পারিবে। দাক্ষিণাত্যে কুমারী নাজির বাঈ নিজ ভ্রাতার নিকট হইতে ব্যায়াম শিখিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বালিকাদিগের ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্যায়াম

স্বামী ও পত্নী একই স্থানে ব্যায়াম অভ্যাস করিও না। স্বামীকে

কষ্টসাধ্য নানা প্রকার ব্যায়ামই অভ্যাস করিতে হইবে। পত্নীকে গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়াও দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে সর্ব্বদা মন রাখিতে হইবে। বাটনা বাটিবার ও জল টানিবার কালে হাত ও পায়ের মাংস-পেশীগুলির প্রতি মন রাখিলেই ঐ সকল মাংসপেশী পুষ্ট হইতে থাকিবে। অনেকে বলেন, ব্যায়াম করিলে স্ত্রীলোকের লাবণ্য কমিয়া যায়, কিন্তু ইহা একান্তই মিথ্যা কথা। ভারতীয় নারী যে তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য হারাইতেছে, তাহার মূল কারণগুলি দূর করিতে হইলে, প্রকাশ্য ভাবে না হউক, গুপ্তভাবে হইলেও, ব্যায়াম-সাধনার প্রচলন করিতেই হইবে। পত্নীর ব্যায়াম-শিক্ষক স্বয়ং স্বামী হইলেই নিরাপদ। ব্যায়ামাভ্যাস-কালে উভয়কেই মনে রাখিতে হইবে যে, মনের শক্তিই শক্তি এবং দেহের শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টার পশ্চাতে মনকে একাগ্র করিতে পারিলেই শক্তি লাভের চেষ্টা সফল হয়। অনেকে আছেন, যাঁহারা নিয়মিতভাবেই ব্যায়ামাভ্যাস করেন, কিন্তু ব্যায়ামের পরিমাণ অনুযায়ী সুফল লাভ করিতে পারেন না। এই সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্যায়াম-অভ্যাসের কালে বল-লাভের প্রতি মন উপযুক্ত রূপে একাগ্র হয় নাই। অতএব ব্যায়াম-সময়ে মনকে বিষয়ান্তর হইতে টানিয়া আনিয়া দৈহিক শক্তির ধ্যানেই মগ্ন করিতে হইবে।

ব্যায়ামের স্থান ও প্রণালী

ব্যায়াম ও মনোনিবেশ

সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রথম সন্তানটী জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই দেহগঠনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ। সন্তান জন্মিলে পিতার পক্ষে অধিকতর অর্থোপার্জ্জন ও মাতার পক্ষে শিশুর সর্ব্বতোমুখ তত্ত্বাবধান বাধ্যকর হইয়া পড়ে। ফলে, আত্মগঠনের চেষ্টায় প্রচুর বাধা জন্মে। দীর্ঘকাল পরে-পরে সন্তান জন্মিলে স্বামিপত্নীর সকল দিকেই কুশল হয়। সুতরাং

ব্রহ্মচর্য্য, ভগবদুপাসনা, ব্যায়াম-সাধনা প্রভৃতি সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ পাইবার বা পালন করিবার পূর্ব্বেই যাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারা এখন হইতেই বদ্ধপরিকর হও যেন, দেহমনের উপযুক্ত উৎকর্ষ লাভ হইবার পূর্ব্বে পরবর্ত্তী সন্তান মাতৃগর্ভে প্রবেশ না করে।

জনন নিরোধ

এইজন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিও না। কারণ ঔষধাদি দ্বারা জনন-রোধের চেষ্টায় নৈতিক অবনতি ত' আছেই, অধিকন্তু উহা প্রসূতির পক্ষে অধিকাংশ সময়ই ঘোরতর বিপজ্জনক ও দুরারোগ্য রোগের উৎপাদক। বিশেষতঃ আজ পর্য্যন্ত গর্ভনিরোধের যতগুলি উপায় যতদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটীও নিশ্চিত সাফল্য দেয় না, ফলে, ঔষধাদি প্রয়োগ সত্ত্বেও যে সব সন্তানসন্ততি ঔষধাদির গুণকে পরাস্ত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারা রুগ্ন দেহ ও রুগ্ন মন লইয়া সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিমাণ বৃদ্ধিই করে। সুতরাং জনন-

জনন রোধের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়

রোধের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণজনক এবং নিরুপদ্রব উপায়ই হইতেছে সংযম-সাধনা। হঠাৎ-সভ্যেরা এই কথাটা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে পারেন কিন্তু দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সমস্যার কোনও সত্য মীমাংসা সম্ভব নহে। যাহাদের সন্তান জন্মিবার পরে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে, তাহারা পরস্পর কিছুকাল বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক উভয়ের দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাসের মধ্যে একটা নৈতিক সঙ্কোচের সুদৃঢ় ব্যবধানে সৃষ্টি করিয়া লইও। আর, যাহারা এখনও পরস্পরের দৈহিক সম্পর্ককে বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারিয়াছ, সেই সকল ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীরা উভয়ের উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক পূর্ণতা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সযত্নে এই সঙ্কোচটুকু রক্ষা

করিও। তোমাদের ঘনিষ্ঠতা মনে প্রাণে বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু যতদিন উভয়ে সন্তান-জননের গূঢ়ার্থ, দায়িত্ব, উপযোগিতা ও পবিত্রতা সম্যক্ উপলব্ধি না করিতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত দৈহিক সম্বন্ধকে বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায় ভয় করিয়া চলিও এবং ভগবৎ-সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জনন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় 'সুরুচিপূর্ণ' * গ্রন্থাদি অধ্যয়নের দ্বারা নারী ও পুরুষের পার্থক্য, এই পার্থক্যের পরিণাম ও উদ্দেশ্য, এই পার্থক্যজনিত দায়িত্বের বিভিন্নতা প্রভৃতি উৎকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নবান্ হইও। বিবাহিত নর-নারীকে সর্ব্বপ্রথমেই এই একটা বড় কথা বুঝিতে হইবে যে, মৈথুন সাময়িক দৈহিক তৃপ্তি মাত্র নহে, পরন্তু দাম্পত্য যোগের সাধন,— মৈথুনাভ্যাস প্রকারান্তরে দম্পতীর পারস্পরিক যোগাভ্যাস। যোগাভ্যাস বলিয়াই ইহার অনুষ্ঠান গোপনে করিতে হয়, পাপ বা অপরাধ বলিয়া নহে।

সঙ্গমের গূঢ়ার্থ

একই অপরাধ যখন সমাজভরা সকল লোকে করিতেছে, তখন গোপনতার আবশ্যকতা কি? পরন্তু, সমাজভরা সকল লোকেই যখন ইষ্টনাম জপ করে, তখন গোপনেই করে, নিঃশব্দেই করে, প্রকাশ্যভাবে করে না। কারণ, যোগাভ্যাস করিতে নীরবতা নিঃশব্দতা ও নিঃসঙ্গতা

---

* জনন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা-মুক্ত হইতে পারে না। তথাপি "সুরুচিপূর্ণ" কথাটা ব্যবহার করার তাৎপর্য্য এই যে, অনেক সময় এই-বিষয়ক গ্রন্থ লেখার দোষে ইন্দ্রিয়বৃত্তির চাঞ্চল্য-বিধায়ক এবং অযথা মৈথুনাদির প্ররোচক হয়; আবার কাহারও হাতে পড়িয়া লেখার গুণে ঐ একই তত্ত্ব সংযমের উৎসাহবর্দ্ধক ও মনশ্চাঞ্চল্য-প্রশমক হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পুস্তককে কুরুচিপূর্ণ ও অপাঠ্য এবং শেষোক্ত শ্রেণীর পুস্তককে সুরুচিসঙ্গত ও পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় এই জাতীয় সুরুচিসঙ্গত গ্রন্থ বড় অধিক নাই।

একান্ত আবশ্যকীয়। বিবাহিত দম্পতীর মৈথুনও তেমনি যোগ-সাধনা, ইহাকে পাপ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। তবে, এই যোগ-সাধনার প্রকৃতি অতিশয় স্থূল। সূক্ষ্ম যোগ-সাধনায় যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা এই স্থূল প্রণালী পরিত্যাগ করেন ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে অগ্রসর হন। পরন্তু, অধিকাংশ গৃহীর পক্ষেই এই স্থূল সাধনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যোগাভ্যাস, তাহা স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, **বিধিপূর্ব্বক করিতে হয়, অবিধিপূর্ব্বক করিলে যোগভ্রংশ জন্মিবে, তাহাতে পাপ ও অপরাধ, হইবে। অবৈধ প্রণালীতে যাহারা মৈথুন রূপ স্থূল যোগ-সাধনা করে, তাহারাই পাপী এবং অপরাধী, মৈথুন-ক্রিয়া তাহাদেরই পক্ষে লজ্জার কারণ।** পরন্তু যাহারা বৈধ প্রণালীতে এই স্থূল সাধনা করেন, মৈথুন তাহাদিগকে লজ্জিত করে না, যেহেতু, তাঁহাদের মৈথুন-ক্রিয়ার ফলে জগত-পাবন মহাপুরুষের আবির্ভূত হন এবং কুলকে পবিত্র ও পুণ্যময় করেন। এই ব্যাপারে পুরুষ কর্ম্মযোগী, নারী ভক্তিযোগী; পুরুষের চাই পুরুষকার, নারীর চাই নির্ভর; পুরুষের সাধনা সঞ্চয়ের ও সংযমের, নারীর সাধনা আনুগত্যের ও অপেক্ষার। এই ব্যাপারে ইহারা ভোগী নহেন, উভয়েই যোগী এবং দেহ ও মনের সম্যক্ পবিত্রতা ব্যতীত যোগাভ্যাস হয় না।

দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যাতেও উপাসনা করিবে। পারিবারিক অধীনতা-হেতু একান্ত অসম্ভব না হইলে এই সময়েও শক্তিসাম্য করিও। কিন্তু

এই দুই সময় পার না পার, রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে উপাসনা করিতে শক্তিসাম্য অবশ্যই করিবে। নিদ্রিতাবস্থাতেও আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের নানা প্রকার গঠন লাভ হইতে থাকে। সমগ্র দিন মন যে যে কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, নিদ্রাযোগে তাহার অনুরূপ ভাবে নিজকে প্রস্তুত করে। শয়নের পূর্ব্বে গভীর উপাসনা ও একাগ্র শক্তিসাম্য হইলে নিদ্রাযোগে মন জীবন-গঠনের অনুকূল ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারে। নতুবা সারাদিনের বৃথা কোলাহলের নিরর্থক স্মৃতি বহন করিয়া সে নিদ্রাযোগে নানা দুর্ব্বলতা, বৃথা বিষয়াসক্তি ও উন্নতিবিরোধী জঞ্জাল সঞ্চয় করে।

মাধ্যাহ্নিক ও সান্ধ্য উপাসনা

প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বামিস্ত্রীর সম্মিলিত ভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ একান্ত আবশ্যক। ইহাতে নানাবিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে একে অন্যের মনোভাব ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়, বিশেষতঃ পিতৃগৃহে বালিকা-পত্নী যে সকল উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতে পারে নাই, স্বামীর সহায়তায় তাহার অভাব পূরণ হয়। স্ত্রীজাতির শিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে মিথ্যা বিশ্বাস দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, পদনখাঘাতে তাহা চূর্ণ করিতে হইবে। শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধ নাই, বরং অনুমোদন ও আদেশ আছে। অপালা, শাশ্বতী, লোপামুদ্রা, আত্রেয়ী, বিশ্ববারা, পৌলোমী প্রভৃতি বৈদিক যুগের মহিলারা বেদমন্ত্রের রচয়িত্রী ছিলেন। ঋগ্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণে গার্গীর ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর যে সংবাদ অবগত হওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়াও অতি উচ্চস্তরের ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। ঋগ্‌বেদে, যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে স্ত্রীলোকের শিক্ষার

সদ্‌গ্রন্থপাঠ

শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষা

পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এবং হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পারস্কর-গৃহ্য-সূত্রে, গোভিল-গৃহ্য-সূত্রে আপস্তম্ভ-শ্রৌত-সূত্রে, আশ্বলায়ন-শ্রৌত-সূত্রে, লাট্টায়ন-সূত্রে, পূর্ব্বমীমাংসায়, যম-সংহিতায় এবং হারীত-সংহিতায় স্ত্রীলোকের বেদপাঠ ও শিক্ষার্জ্জনের সমর্থন আছে। রামায়ণ ও মহাভারত হইতেও এতদ্বিষয়ক প্রমাণ মিলিবে। দ্রৌপদী বিদুষী ছিলেন, বনপর্ব্বে শিবা নাম্নী বেদপারগা ব্রাহ্মণীর কথা আছে, শান্তি পর্ব্বে যোগপারগা বেদবেত্রী সুলভার কথা আছে। পরবর্ত্তী যুগে কর্ণাট-রাজ মহিষীর নিকট কবি কালিদাস এবং মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়-ভারতীর নিকট শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায় জয়ী হইতে পারেন নাই বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা মোটেই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রয়োজন নাই বলিয়া যে এক কুসংস্কার অধিকাংশ সমাজিক মানবের মনের উপর রাজত্ব করিতেছে, তাহার শাসন মানিয়া কাপুরুষের মত বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিপদের মাঝদরিয়ায় হাল ধরিবার ক্ষমতা যে নারীরও আছে এবং সুশিক্ষা পাইলে নারী যে তাহার এই ক্ষমতাকে নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতে পারে, এই কথাটায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া স্বামীদিগকে পত্নীশিক্ষায় মনোযোগী হইতে হইবে।

নারীর সুশিক্ষা ও তাহার স্নেহ-প্রেম

নারীর হৃদয়ে পতিপ্রেম ও সন্তানস্নেহ থাকিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করি না। পতিপ্রেম ও সন্তানস্নেহের প্রকাশটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুতম প্রণালীতে না হইতে পারিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নারী তাহার পরিপূর্ণ মহিমাকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি না। স্বামীকে ভালবাসিয়া যে পত্নী

নিয়ত রতিদানেই তৎপরা থাকে, অথবা সন্তানকে ভালবাসিয়া যে মাতা সন্তানের পাকস্থলীর শক্তিসামর্থ্যের কথা গণনায় না আসিয়া গ্রাসের পর গ্রাস অন্ন কেবলই মুখে গুঁজিতে থাকেন, তাহাদের প্রেম ও স্নেহ সম্বন্ধে সন্দেহ করি না, কিন্তু যে ভাবে এই প্রেম ও স্নেহ প্রকাশিত হইল, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিকে মহিমময়ী মনে করিতে পারি না। কিন্তু সুশিক্ষা পাইলে নারী তাঁহার এই প্রেম ও স্নেহকে উৎকৃষ্টতর ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। অসংযত স্বামীকে অস্বাস্থ্য ও নৈতিক দুর্গতি হইতে এবং পেটুক সন্তানকে অতিভোজন ও তজ্জনিত পীড়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার ঐ প্রেম ও স্নেহকেই উৎকৃষ্টতর কোশলে পরিচালিত করিতে পারেন। এই জন্যই নারী জাতির সুশিক্ষার অত্যধিক প্রয়োজন। বনমানুষের পত্নী কি চিরসাথী বনমানুষটাকে ভালবাসে না? ব্যাঘ্রিনী কি তাহার বাচ্চাকাচ্চাগুলিকে স্নেহ করে না? কিন্তু সে প্রেমের ও স্নেহের দৌড় কতখানি? অতটুকু প্রেম আর অতটুকু স্নেহ দিয়া এবং পাইয়া কি মানুষের চিত্ত তৃপ্ত হইবে? তাই সুশিক্ষার প্রয়োজন। যে স্নেহ-প্রেম নারীর বক্ষ-জোড়া রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্বটা তিনি যাহাতে গভীরতর ভাবে অনুভব করিতে পারেন এবং তাহার প্রসার যাহাতে স্বামী ও সন্তানের উপরে শ্রেয়োমুখী কল্যাণ বিস্তার করিতে পারে, তাহার জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজন। স্বামী যতখানি জ্ঞান এবং বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছেন, সম্ভব হইলে স্ত্রীর পক্ষেও ততখানি অনুশীলন প্রয়োজন। পিতৃগৃহে বালিকাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না, সুতরাং ইহার ভার স্বামীদিগকেই লইতে হইবে এবং স্বামীর সর্ব্ববিধ সাধনায়, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য, সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে সুযোগ্যা সহযোগিনীরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নারী যে পুরুষের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-মূলক কুচিন্তাগুলিরই কেন্দ্র নহে, নারী যে ইহা অপেক্ষা মহত্তর চিন্তার কেন্দ্র হইতে পারে, তাহা বুঝিবার এবং বুঝাইবার জন্য ধারা-বাহিক ভাবে এইরূপ সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা দরকার। মৌখিক উপদেশের দ্বারা ফল যাহা হয়, গ্রন্থ-পাঠের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা তাহা অপেক্ষা ফল অধিক হয়। সুতরাং মনুষ্যত্ববর্দ্ধক সদ্‌গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত তাহা অধ্যয়ন করা উচিত। সম্ভবতঃ রাত্রিতে উপাসনার পূর্ব্বেই গ্রন্থপাঠ অধিকাংশ দম্পতীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

স্বামীগৃহে নারী শিক্ষার আদর্শ

নৈশ উপাসনার পরে আর একটী মুহূর্ত্তও বাক্যব্যয়ে কাটাইবে না। নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া পুনরায় ভগবানের নাম জপ করিতে থাকিবে এবং নিদ্রাকর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত শয়ান হইবে না।

পরস্পর পৃথক শয্যায় শয়ন করিবে। মৈথুন বর্জ্জন করিয়াও যাহারা এক শয্যায় শয়ন করে, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রায়শঃ রক্ষিত হয় না। কারণ, ইহাতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সত্তাশক্তি অনেক ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্যে ক্ষয়িত হয়। জগতের কল্যাণের প্রয়োজনে তোমাদের দৈহিক মিলনের অধিকার সর্ব্বদাই রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রয়োজনে একমাত্র সন্তানজনন কালটী ব্যতীত অপর সময় যথাসাধ্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করিবে।

শয়ন

তোমাদের উভয়ের বিবাহিত জীবনের প্রত্যক্ষ বিস্তার যে সন্তান লাভে, এই কথাটী উভয়কে অতি উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে সন্তান প্রকৃতই তোমাদের জীবনকে সঙ্কুচিত না করিয়া সন্তানিত অর্থাৎ বিস্তারিত করিবে, তেমন ব্যক্তি যে খেয়ালে খেয়ালে জন্মে না, তাহার জন্য যে কঠোর সঙ্কল্প করিতে হয়, কঠিন সাধনা করিতে হয়,

ইহা মনে রাখিতে হইবে। অন্ততঃ এক বৎসরকাল সংযমী ও সদাচারী না থাকিয়া এবং একটীমাত্র আদর্শের অনুসরণে চেষ্টা না করিয়া কিছুতেই সন্তানজননে প্রবৃত্ত হইও না। তোমরা কিরূপ সন্তানের প্রার্থনা কর, ঋতুরক্ষার এক বৎসর পূর্ব্বেই তাহা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত করিয়া লও এবং কঠোর প্রযত্নে তদনুযায়ী ভাবে আত্মপ্রস্তুতিতে ব্রতী থাক। ইহাই পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ। যদি তোমরা দেশকল্যাণকারী বীর সন্তান চাহ, তবে এই নির্দ্দিষ্ট কালটুকু ব্যাপিয়া প্রাণপণে দেশের সেবা করিতে যত্নবান্ হও এবং দেশের সেবায় জীবন দিয়া যাহারা জগদ্বরণ্যে হইয়াছেন, তেমন বীরাত্মা মহাপুরুষগণের জীবন-প্রণালী অধ্যয়ন ও অনুশীলন কর। চিত্তমধ্যে ক্ষোদিত করিয়া রাখ, রাণা প্রতাপ কেমন করিয়া স্বাধীনতার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ কেমন করিয়া আত্মধ্যান-পরায়ণ যোগীর সমাজকে যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করিয়া মহিমান্বিত স্বধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, চাঁদবিবি কেমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যোয়ান অব্ আর্ক সামান্যা পশুপালিকা হইয়াও কেমন করিয়া পদানত ফ্রান্সের স্বাধীনতার পতাকা নূতন করিয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন। যদি তোমরা জগৎকল্যাণকারী বীর সন্তান চাহ, তবে এই নির্দ্দিষ্ট কালটুকু জগৎ-কল্যাণকারী মহাত্মদের জীবনপ্রণালী অধ্যয়ন ও অনুশীলন কর। চিত্তমধ্যে ক্ষোদিত করিয়া রাখ, কেমন করিয়া শাক্যসিংহ বিশ্বদুঃখ বিদূরণের জন্য রাজৈশ্বর্য্য ও প্রেমময়ী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় ভিক্ষু সাজিয়াছিলেন, একটা সামান্য ছাগশিশুর জীবন রক্ষার জন্য বিনিময়ে নিজ মহামূল্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কেমন

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

করিয়া যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া পরার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া দধীচি স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য, ত্রিলোকশত্রু বৃত্রাসুরের সংহারের জন্য, সহাস্য আননে তাঁহার চিরশত্রু ইন্দ্রের হস্তে নিজ অস্থি তুলিয়া দিয়াছিলেন। তীব্রভাবে এই সকল মহচ্চিন্তার অনুশীলন কর, নিশ্চিন্ত জানিও, ইচ্ছানুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট সন্তান-সন্ততির জন্মদান করিয়া তোমরা কৃতার্থ হইতে পারিবে। শুধু তাহাই নহে, তোমাদের সঙ্কল্পের শক্তিই জঠরস্থ সন্তানকে ইচ্ছানুসারে পুত্র বা কন্যাতে পরিণত করিবে।

মহৎ চিন্তার চর্চ্চা

ইচ্ছানুযায়ী পুত্র ও কন্যার জন্মদান

ইচ্ছানুসারে পুত্রকন্যা উৎপাদন করিবার জন্য বিভিন্নপন্থী যোগীরা বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। যথা,—

(ক) স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস থাকা কালে বীর্য্যাধান হইলে পুত্র জন্মে। ঋতুরক্ষা-কালে উভয়ের শ্বাস ইড়া নাড়ীতে থাকিলে কন্যা জন্মে।* উভয়ের মধ্যে একের ইড়ায় এবং অপরের পিঙ্গলায় থাকিলে স্ত্রীপুরুষ-মধ্যে যাহার শক্তি অধিক, তজ্জাতীয় সন্তান অথবা যমজ পুত্রকন্যা হইবে; উভয়ের শক্তি তুল্য হইলে নপুংসক হইবে।

(খ) পুরুষের শুক্রকোষের দক্ষিণ অংশ হইতে বীর্য্যাধান হইলে পুত্র, বাম অংশ হইতে কন্যা, উভয় অংশ হইতে অসম পরিমাণে পতিত হইলে, যে অংশ অধিক, সেই অংশানুরূপ এবং উভয় অংশ হইতে সমপরিমাণ পতিত হইলে নপুংসক জন্মিবে।‡

(গ) নারীর ডিম্বাধারের বাম অংশ হইতে ডিম্ব পুরুষবীর্য্যে মিশ্রিত হইলে পুত্র, দক্ষিণ অংশ হইতে কন্যা, ইত্যাদি।

---

* মতভেদও দৃষ্ট হয়।

‡ বৈজ্ঞানিকেরা এ কথায় দ্বিধা প্রকাশ করেন।

(ঘ) উভয়ের কুম্ভকে মিল থাকিলে স্ত্রীর আভ্যন্তর ও পুরুষের বাহ্য কুম্ভক কালে রজোবীর্য্যের মিলন হইলে সন্তান কন্যা এবং স্ত্রীর বাহ্য ও পুরুষের আভ্যন্তর কুম্ভক-কালে রজোবীর্য্যের মিলন হইলে সন্তান পুত্র হয়।

এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইলে দাম্পত্য সাধককে এমন যৌগিক সামর্থ্য আয়ত্ত করিতে হয়, যেন, ইচ্ছানুসারে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিকে নির্দ্দিষ্ট নাড়ীতে পরিচালিত করিতে, শুক্রকে ইচ্ছামত দক্ষিণ বা বামকোষ হইতে নিঃসৃত করাইতে, নারী-বীর্য্যকে বাম বা দক্ষিণ ডিম্বাধার হইতে বহির্গত করাইয়া জরায়ুতে আনিয়া পুরুষ-বীর্য্যের সহিত মিলাইতে এবং একই সময়ে উভয়ের বিপরীত কুম্ভকের মিল রাখিতে কোনও কষ্ট না হয়। বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে চেষ্টা করিলে চতুর্থ উপায়টী সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু অপরাপরগুলি প্রকৃতই অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আমাদের মতে এই সকল ব্যাপার লইয়া খুব বেশী শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত না করিয়া নিয়মিত ভগবৎ-সাধনার দ্বারা দিনের পর দিন এরূপ আধ্যাত্মিক সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্যই যত্নবান্ হওয়া উচিত, যাহাতে, সন্তান-জননকালে মানসিক প্রশান্ততা কিছুতেই হ্রাস-প্রাপ্ত না হয়। মনের প্রশান্ত অবস্থায় শ্বাসবায়ু সুষুম্নায় অর্থাৎ উভয় নাসায় থাকে। শ্বাসের সুষুম্নাবস্থিতিই জগতের সকল কল্যাণ-কর্ম্মের সুসময়। মহামুদ্রা, * কাকীমুদ্রা, অশ্বিনীমুদ্রা, যোনিমুদ্রা এবং সর্ব্বোপরি প্রাণায়াম ও নামজপের দ্বারা সুষুম্নাদ্বার উন্মোচিত হয়। সুতরাং বর্ষব্যাপী সঙ্কল্প ও তপঃ-সাধনের পরে স্বামিপত্নী এই সকল উপায়ে সুষুম্নাদ্বার উন্মোচিত করিয়া তৎপর চিত্তভাবের মালিন্য-নাশক প্রক্রিয়াবলম্বনে কুলপ্রথাগত পবিত্র নিয়মানুসারে ভগবানের নাম

* "সংযম সাধনা" দ্রষ্টব্য।

উচ্চারণ করিতে করিতে সন্তান-জনন করিলে সন্তান জগতের কল্যাণকারী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। গর্ভাধান পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য বিধিমত অনুষ্ঠিত হইলে, তৎপর ভ্রূণকে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র বা কন্যায় পরিণত করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কারণ জননীর সঙ্কল্পের শক্তিই এই বিষয়ে প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা।

কথাটী বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দিক হইতে একটু আলোচনা করিতেছি। আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (প্রফেসার চাইল্ড) বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ এবং রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবগণের ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

লিঙ্গান্তরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত যেমন, জলের সহিত অল্পমাত্রায় ম্যাগ্নেসিয়াম্ ক্লোরাইড্ গুলিয়া তাহাতে ডিম ফুটাইলে, মৎস্য-শাবকের ললাটের দুই পার্শ্বে দুইটী চক্ষু না হইয়া মধ্যস্থলে একটী মাত্র চক্ষু ফোটে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগে জীবগণের দৈহিক উপাদান সমূহের পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়াই এই ভাবে অঙ্গবিশেষের বৃদ্ধি, সঙ্কোচ, নবোদ্গম বা বিলোপ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক অ্যালেন (Allen) ও ডয়্সি (Doisy) সাহেবদ্বয় মনুষ্যদেহের "হোরমোন্" (Hormone) নামক রসের অপূর্ব্ব কার্য্য ও গুণ প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, ইহারই পরিমাণের তারতম্যদ্বারা জীবদেহে স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের নির্দ্ধারণ হয়। ভ্রূণ ত' সামান্য কথা, যে সকল প্রক্রিয়ায় দেহের "হোরমোন্" পদার্থের প্রয়োজনানুরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান সম্ভব, তাহাদের প্রয়োগে পরিণত-দেহ পূর্ণযৌবন প্রাণীর পর্য্যন্ত লিঙ্গান্তর ঘটিতে পারে। এডিনবার্গ সহরের ডাক্তার ক্রু (Dr. Crew) এই ভাবে একটী পূর্ণায়তন কুক্কুটীকে কুক্কুটে

পরিণত করিয়াছেন। ডাক্তার অস্কার রীডল্ (Dr. Oscar Riddle) নামক বৈজ্ঞানিক একটী পূর্ণ-যৌবনা কপোতীকে এই ভাবে লিঙ্গান্তরিত করিয়াছেন। নানাপ্রকারের 'ভাইটামিন' (Vitamine) এবং হর্মোন্ (Hormone) পদার্থ জীবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়াই তাঁহারা এই সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। এই সকল রাসায়ণিক পদার্থের যেমন জীবদেহের উপাদানগত পরিবর্ত্তন আনয়ন করার ক্ষমতা আছে, মানুষের চিন্তারও তেমন শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাই একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রোধমূলক চিন্তাকারীর থুথুতে এমন এক প্রকার বিষ পাওয়া যায়, যাহা ক্রোধোদ্রেকের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির থুথুতে ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, চিন্তাদ্বারা দৈহিক উপাদান সমূহের পরিবর্ত্তন অবশ্যই সাধিত হয়। রক্ত একবার পরীক্ষিত হইবার পর একজন সুস্থদেহ পবিত্রচিত্ত ব্যক্তি যদি দারুণ কামচিন্তায় নিরত হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার রক্ত পরীক্ষার পর দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বপরীক্ষার ফলের সহিত এই পরীক্ষার ফল মিলিতেছে না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, চিন্তাদ্বারা দেহের উপাদানের পরিবর্ত্তন হয়। তেঁতুল দেখিলে জিহ্বা হইতে জল পড়ে,—ইহাও চিন্তারই ক্ষমতা। যে ব্যক্তি তেঁতুলের দিকে দৃষ্টি দিয়াও মনকে অন্য কোনও বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে, তাহার জিহ্বা জলসিক্ত হয় না। তেমনি চিন্তার বলে দেহের "হোরমোন্" জাতীয় পদার্থের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পাদনও নিশ্চিতই সম্ভব। যোগারা যে ইচ্ছার শক্তিতে দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নদীর উপর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, উর্ণনাভ-তন্তু অবলম্বনে শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে আকাশের এক প্রান্ত

চিন্তার শক্তি ও শরীরের আণবিক পরিবর্ত্তন

হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করিতে পারেন, বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারেন, শিলামধ্যে বা অগ্নিকুণ্ডেও প্রবেশ করিতে পারেন,—এই সকল কথা জড়বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করিবার উপায় যদি নাও থাকে, তথাপি সঙ্কল্পের শক্তিতে যে ইচ্ছানুযায়ী পুত্রকন্যা জনন সম্ভব, তাহা অতি সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাকে অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া বিধিমত সঙ্কল্পের সাধনা করিবে।

গর্ভাধানের পর রজোবন্ধ হইলেই স্বামী স্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিবে, স্ত্রী স্বামীকে সন্তান বা পিতৃবৎ জ্ঞান করিবে। স্বামীর দেহই পত্নীর গর্ভে বাস করিতেছে, পত্নীই স্বামীর দেহকে দশ মাস দশ দিন পর প্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং জঠরস্থ সন্তান প্রসূত হইয়া মাতৃস্তন্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত পরস্পরের দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের চিন্তাকেও ধর্ম্মদ্রোহ বলিয়া ভয় করিয়া চলিও।

গর্ভধানের পর স্বামিস্ত্রীর মনোভাব

পশুর-অধম হিতাহিত-বুদ্ধিবর্জ্জিত অপদার্থ জীবন কয়েক পুরুষ ধরিয়াই ত' যাপন করিয়া আসা হইতেছে, আজ হইতে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়চর্চ্চার সম্পর্কে ধর্ম্মবুদ্ধি ও সঙ্গতিবোধকে এখন হইতে একান্ত জাগ্রত রাখিতে হইবে।

গর্ভাধানের পর হইতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সর্ব্বদা হৃষ্ট ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য, অতৃপ্তি, অসন্তোষ, বিরক্তি, বিদ্বেষ ও বিষণ্ণতা সন্তানের মানসিক অবনতি ঘটায়। যে দৃশ্য দর্শনে চিত্ত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শতদল মেলিয়া দেয়, যে বাক্য শ্রবণে পরাণ জুড়িয়া আনন্দ-হিল্লোল সমীরিত হয়, যে

সুখময়ী স্মৃতির উদ্দীপনে পবিত্রতার প্রেমমাখা প্রবাহে চিত্ত অবগাহন করে, তাহাই গর্ভিণীর নয়নপথে, শ্রবণপথে ও মনন-পথে সমারূঢ় হওয়া উচিত।

গর্ভাধানের দিন হইতে সন্তান প্রসবের দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীকে নিম্নলিখিত নিয়মটী পালন করিয়া চলিতে হইবে। তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র বা কন্যা লব্ধ হইবে। এই নিয়মটী ভারতীয় জীবনে বহুকাল যাবৎ সফলতার সহিত পালিত হইয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি জাপানের একজন চিকিৎসক নাকি ইহার অনুরূপ একটী প্রণালী অবলম্বনে ১৯৫২ জন গর্ত্তধারিণীর মধ্যে ১৯০৮ জনের ইচ্ছানুযায়ী পুত্র বা কন্যা লাভের চেষ্টায় সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন। জাপানী চিকিৎসক অবশ্য খেয়ালে-খেয়ালে তত্ত্বটা আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় গার্হস্থ্যাশ্রমী যোগীরা এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। এই জন্য জাপানী চিকিৎসকের উপদেশের সহিত তুলনায় নিম্নলিখিত উপায়টী সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ। যথা,—

গর্ভাধানের পর স্ত্রীর করণীয়

স্বামীর সহিত সম্মিলিত উপাসনা ও শক্তি-সাম্য করিয়া আসিয়া মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া বসিয়া জালন্ধর বন্ধ অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্কোচনপূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক সংন্যস্ত করিবে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভ্রূমধ্যের সহিত নাভিমূলের একটা জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি-সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া ভাবনা করিবে। তৎপরে জরায়ু-মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়া বার বার সঙ্কল্প করিতে থাকিবে,—"আমার গর্ভে বীর্য্যবান্, তেজস্বী, পরমকর্ম্মী পুত্র উৎপাদিত হউক," অথবা, কন্যা-প্রার্থনা থাকিলে,—"বীর্য্যবতী, তেজস্বিনী, পরমকল্যাণময়ী কন্যা উৎপাদিতা হউক।" যতক্ষণ নিদ্রিতা

না হও, ততক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত বার বার এই একমাত্র সঙ্কল্পই করিতে থাকে। একদিনও যেন বাদ না যায়, একদিনও যেন ভুল না হয়, একদিনও যেন মনোযোগ না কমে। দিনের পর দিন একই সঙ্কল্পের সাধন করিতে করিতে তোমার ইচ্ছা দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করিবে। বিশ্বাস কর, সাফল্য তোমার অবশ্যম্ভাবী; তুমি যতই সামান্যা নারী হইয়া থাকনা কেন, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিয়মিত অভ্যাস, নিরন্তর উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাসের বলে নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা এই যে, **এই ব্যাপার-সম্পর্কিত কথা বাহিরে সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া চলিতে হইবে।** শুধু এই বিষয়েই নহে, দাম্পত্য জীবনে আত্ম-গঠন-প্রযত্নে গোপনতা সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়। সৎসঙ্কল্পের কথা অন্তরের নিভৃত প্রদেশে গোপন যাহারা রাখিতে পারে না, ক্রমশঃ বহিরালোচনার সুযোগে তাহাদের সঙ্কল্পের মূলদেশ শিথিল হয়, দৃঢ়তা কমিয়া যায়। দাম্পত্য ঘনিষ্টতার ভিতর দিয়াও ব্রহ্মচর্য্যকে, ইন্দ্রিয়-সংযমকে, নিষ্কলুষ নিষ্কামতাকে অটুট রাখিবার ব্রত যাহারা গ্রহণ করিয়া সফলতার সহিত ব্রত-পথে অগ্রসর হইতেছে, এমন বহু দম্পতী মন্ত্রগুপ্তির অভাব হেতু সঙ্কল্পচ্যুত ও ব্রতভ্রষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রগুপ্তি জীবনের অধিকাংশ সাধনায়ই সিদ্ধিপথের পরমবান্ধবী।

উপসংহার

যত কথা বলিবার ছিল, সব কথা বলিতে পারি নাই। যাহা অকথিত রহিল, তাহা বিবাহিত দম্পতীরা নিজ নিজ সাধন-জীবনের পূর্ণতার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবেন। ভগবান্‌কে জীবনের সিংহাসনে তাঁহারা যতটুকু স্থান দান করিবেন, দাম্পত্য সাধনার প্রকৃত অর্থ, ব্যাপ্তি ও প্রভাবের পরিচয় ততই তাঁহাদের আচরণে স্ফূটতর হইয়া উঠিতে থাকিবে। ভগবান্‌কে যতই তাঁহারা ভুলিয়া থাকিবেন, ততই তাঁহারা অন্ধকারে ডুবিবেন, কল্যাণ-বঞ্চিত হইবেন, দুঃখের হাহাকারে গগন-পবন প্রপূরিত করিবেন। ইহমুখ স্থূলসত্ত্ব পাশ্চ্যাতেরা বিবাহিত জীবনের মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া মৃত্যু-সঙ্কুল স্বাধীন প্রেমের মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইহকালকে অস্বীকার না করিয়াও দাম্পত্য জীবনের মধ্যে পরকালের কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। দেহজ্ঞানী পশ্চিম নারী ও পুরুষের আকর্ষণের মধ্যে ভগবান্‌কে খুঁজিয়া না পাইয়া মদির পিপাসার পঙ্কাবর্ত্তে ডুবিয়া শুধু বিভ্রাটই ঘটাইয়াছে, শুধু বিপদই আহরণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ দেহের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনকে তাচ্ছল্য না করিয়াও দেহের মধ্য দিয়াই আত্মার উদ্ধার এবং আত্মার মধ্য দিয়াই দেহের উদ্ধার সাধন করিবে।

হে ভারতের নবীন তাপস এবং তাপসী, হে ভবিষ্যৎ ভারতীয় মহা-মানব-জাতির জনক এবং জননীবৃন্দ, তোমরা আজ ভুলিও না যে, তোমাদের জীবনের সংযম বা অসংযম জাতির ভবিষ্যৎকে গৌরবোজ্জ্বল অথবা মসীকৃষ্ণ করিয়া দিতে পারে। আমরা আমাদের বর্ত্তমান দেহ

পরিত্যাগের কাল আসিলে পুনরায় তোমাদেরই ঔরসে এবং জঠরে নব-জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতীর্থময়ী এই ভারত-ভূমির পূণ্যপীঠে ভূমিষ্ঠ হইতে চাই। যে ঔরস সংযম-রক্ষিত এবং যে জঠর তপস্যাপূত, তেমন ঔরসে তেমন জঠরে স্থান না পাইলে যে আমাদের বিশ্বগ্রাসিণী কল্যাণাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিব না! সমগ্র জীবনের আপ্রাণ প্রয়াসের দ্বারা যদি সামান্য কিছু সুকৃতিও সঞ্চিত করিবার সৌভাগ্য পাই, ঔরসের দোষে আর জঠরের দোষে যে তাহা ম্লান হইয়া পড়িবে বাছারা! তাই বলি, কৃতাঞ্জলিপুটে বলি, অনুনয়ের সহিত বলি, একান্ত কাতরতার সহিত বলি,—হে বিবাহিত ভারত, হে দাম্পত্য ভারত, নিত্যমুক্তিকামী মহাপুরুষদের অবতরণের জন্য না হউক, আমাদেরই ন্যায় যাঁহারা মুক্তি-প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ, আমাদেরই ন্যায় কোটি কোটি বার জন্ম-মরণের অসহনীয় দুঃখ কষ্টকে যাঁহারা যাচিয়া চাহেন, অন্ততঃপক্ষে সেই সকল মানবাত্মার নবদেহে নবসংগ্রামলীলার জয়িষ্ণুতা বর্দ্ধনের জন্য তোমরা সংযত হও, আত্মস্থ হও, মানুষ হও। আমাদের ন্যায় সামান্য মানবেরাও জগৎকল্যাণের অফুরন্ত প্রার্থনার শক্তি লইয়া নূতন দেহে যে দিন তোমাদের ক্রোড়ে ঠাঁই পাইবেন, সেই দিন তাহাদিগকে নিত্যমুক্ত মহাপুরুষদেরই মতন দেখাইবে, সেই দিন তোমাদের আঙ্গিনা নিত্য-কিশোরেরই নয়নানন্দ নৃত্যলীলায় লাঞ্ছিত হইবে। সে দিন তাঁহাদের ও যেমন প্রাণ জুড়াইবে, তোমাদেরও তেমন দগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে। হে গৃহী ভারত, আজ তাহারই জন্য প্রস্তুত হও।

পরিশিষ্ট

["বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থ প্রকাশের ফলে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক কৌতূহলী পাঠকের নানা নিগূঢ় বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা গ্রন্থকারকে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। ঐ সময়ের কতক কথোপকথন লিখিতভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। সেই কথোপকথন সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রকাশিত হইল।]

কাম ছাড়া জীবসৃষ্টি যে হ'তেই পারে না, একথা সত্য নয়। অন্যান্য জীবের কথা যা-ই হোক্, মানুষের কথা স্বতন্ত্র। সে তার ইচ্ছা-শক্তির বলে সবই কত্তে পারে। ইচ্ছা কর্ল্লেই বাপমায়েরা কামগন্ধ-হীনভাবে সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতে পারেন।

সহবাস ব্যতীত কখনও সন্তান জন্মাতে পারে না, একথা ঠিক ; কিন্তু কামগন্ধহীনভাবে সহবাস হ'তে পারে। সেই সহবাসে ভোগলিপ্সা নেই, আছে কর্ত্তব্যবুদ্ধি। তাতে মত্ততা নেই, আছে মনের গভীর স্থিরতা, আছে হৃদয়ভরা কল্যাণ-প্রেরণা।

এ কথা অসম্ভব বলে মনে হবারই কথা। অধিকাংশ মানবেরই জন্ম কাম থেকে হচ্ছে। কাম-সংস্পর্শ-মাত্র-শূন্য হয়ে যে দু-একজন মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তাঁদের পিতামাতার মনের ইতিহাস জগৎ কি জানতে পেরেছে? সাধারণ লোক নিজ নিজ মন দিয়ে সকলের মনকে বিচার কচ্ছে। তাই তারা দেখ্‌তে পাচ্ছে যে, কাম ছাড়া জন্ম অসম্ভব। কিন্তু নিজের মনকে নিয়ে যাঁরা অনেক কসরৎ করেছেন, অনেক খাটুনি খেটেছেন, তাঁরা অনায়াসে বুঝতে পারেন যে, সাধক গৃহীরা ইচ্ছা কর্‌লে দেহকে এক স্থানে এক কাজে লাগিয়ে মনকে আর এক স্থানে আর এক কাজে রাখ্‌তে পারেন।

যার মন অভ্যাসের বলে নিয়মিত হয় নি, চেষ্টাদ্বারা সংযমিত হয় নি, তার মন উপাসনার কালে কলুটোলায় চটিজুতো কিন্‌তে যায়, আহারে বসে খেলার মাঠে ঘুরে বেড়ায়। এই রকম অব্যবস্থিত মনের কথা আমি বল্‌ছি না। চেষ্টার দ্বারা, নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা মনকে মানুষ আলাদাভাবে তৈরী ক'রে নিতে পারে। আমার পিতৃদেবের মুখে শুনেছি, দশ-বারো জন সমকক্ষ ওস্তাদ-লোক যদি এক সাথে দশটী বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন তালে, বিভিন্ন গান আরম্ভ করে দিতেন, তবে তিনি যে-কোনও নয় জন গায়কের গানে একেবারে বধির থেকে মাত্র একটী গায়কের গান শুন্‌তে পাত্তেন। কাণে এসে সকলেরই গানের আওয়াজ পৌঁচাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন মাত্র একটীকেই গ্রহণ কচ্ছে, বাকীগুলিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা হ'ল তৈরী-করা মনের কথা। মনকে মানুষ এমন ভাবে তৈরী কত্তে পারে যে, দেহটা যখন আগুণে পুড়ে যাচ্ছে, মনটা তখন সেই জ্বালা-যন্ত্রণায় না থেকে দেহমনের অতীত কোনও মহত্তর সত্তায় অবস্থান কচ্ছে। আমাদের দেশের যোগী পুরুষদের অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিণী নাই বল্লাম, এমন কি য়ুরোপেও দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্মমতের জন্য একজনকে পুড়ে মারা হচ্ছে, অথচ তিনি অনুমাত্র কাতরতাও দেখাচ্ছেন না। দেহের চরম দুরবস্থাতেও দেহের মধ্যে তাঁর মন নেই, তিনি যে-ধর্ম্মের উপাসক, যে-আদর্শের ধ্যাতা, সেই ধর্ম্ম ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর মনটীকে তিনি যুক্ত ক'রে দিয়েছেন এবং সেই যোগ এত গভীর হ'য়েছে যে, দেহটা যে আগুণে পুড়ে যাচ্ছে, তা' তিনি টেরও পাচ্ছেন না। যাঁদের মনের বল এম্‌নিতর, তাঁরা অন্যান্য সময়েও ইচ্ছা কর্‌লে মনকে এভাবে অন্যত্র রাখ্‌তে পারেন,—এমন কি ইন্দ্রিয়-চেষ্টার সময়েও।

সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা ইন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, তাঁরা

সবাই একবাক্যে বলেছেন যে কামই জীবসৃষ্টির মূল। কিন্তু যোগ-দৃষ্টি যাঁদের ফুটেছে, তাঁরা একথা সর্ব্বত্র মানতে পারেন না। সাধারণ লোকের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সে শুধু লোকের বহিরাচারটুকুই দেখে, অন্তরের খোঁজ-খবর সে পায় না। যোগীরা অন্তরের খবরাখবর রাখেন। তাই তাঁরা যীশুর জন্মকথাকে 'আজগুবি গল্প' বলে উড়িয়েও দেন না, আবার মেরীর গুপ্ত-প্রণয় ব'লেও ব্যাখ্যা করেন না। বিশ্বাসী যীশু-ভক্তেরা এইটুকু মনে ক'রেই নিশ্চিন্ত যে, মেরীর গর্ভে যীশুর যে আবির্ভাব, তাতে ভগবানের ইচ্ছাই যথেষ্ট, কোনও মানুষের পক্ষে বীর্য্যাধান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা শুনবেন কেন? তাঁরা বললেন, নিশ্চয় যীশুর কোনও পিতা ছিলেন এবং অবৈধ প্রণয়ের ফলে তাঁরই ঔরসে যীশুর জন্ম হয়েছে, নইলে—মেরীর স্বামী যোসেফ কেন জানলেন না? কিন্তু যোগীরা নিজেদের উপমায় এই দুই বিরোধী ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য কত্তে পারেন। কারণ, তাঁরা মনের দিকেই দৃষ্টি দেন এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেও স্বীকার করেন। তাঁরা বিজ্ঞানের যুক্তিকে তুচ্ছ মনে করেন না, যেহেতু যোগবিদ্যাও একটা বিজ্ঞান, স্থূলবিজ্ঞান নয়—সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। তাই তাঁরা যীশুর জন্মের মধ্যে গর্ভ বা ঔরসের উপরে জোর না দিয়ে জোর দেন সেই দুই মহাশক্তিশালী মনের উপরে, যা' যীশুর জননকালে দেহকে দেহের কর্ত্তব্যে নিযুক্ত রেখে নিজেরা ডুবেছিল অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে। এই জন্যই মেরীর যখন গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন তিনি বলতে পার্লেন না, কে এই গর্ভের আধানকারী। যোগী কখনো বিশ্বাস কত্তে পারেন না যে, যীশুর যিনি মা, তিনি জেনে-শুনেও যীশুর জন্ম-কারণ গোপন কর্ব্বেন। যোগীর সিদ্ধান্ত এই যে, যোগসাধনায় যখন মেরী ও যীশু-জনকের নিজস্বতা ব্রহ্মে অর্পিত হ'য়েছিল, এমন শুভ ও পবিত্র

মুহূর্ত্তে যীশু তাঁর মায়ের স্বামীর ঔরসে মাতৃজঠরে স্থান পেয়েছিলেন। সুতরাং বিশ্বাস কত্তে বাধা হয় না যে, সমাজের দৃষ্টিতে যিনি মেরীর স্বামী ছিলেন, তিনিই স্বয়ং যোগাবস্থায় যীশুর জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু মেরীর ন্যায় তাঁরও জনন-বিষয়ক স্মৃতি বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই তিনি মেরীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশে সন্দিগ্ধ হ'য়েছিলেন। অন্ধ-বিশ্বাসীরা যীশুর জন্ম সম্বন্ধে গাথায় বিশ্বাস ক'রে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেন। আবার জড়দৃষ্টি ব্যক্তিরা যীশুর জন্মকে নিজেদের পঙ্কিল মনের প্রলেপ দিয়ে যা-তা ব'লে ব্যাখ্যা করেন। যোগী তা করেন না। যোগী জানেন, বীর্য্যাধানে জীবোৎপত্তি হয়, কিন্তু বীর্য্যাধান-কালেও মানুষ তার মনকে এমন অপার্থিব অবস্থায় রাখ্‌তে পারে, যার খোঁজ পেতে বৈজ্ঞানিককে আরও অনেক শতাব্দী খাটতে হবে। গৃহস্থ যোগী তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এবং মনোজগতের রহস্য সম্বন্ধে তাঁর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তার বলে, পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক এই দুই বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করে নেন।

মানুষের মনের শক্তি যে কত অদ্ভুত, তার সম্বন্ধে তোমার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। যে যা প্রত্যক্ষ করে নি, তার পক্ষে তা কখনো ঠিক ঠিক বিশ্বাসে আসে না। অন্ধ বিশ্বাস একটা বিশ্বাসই নয়। সকল বিরুদ্ধ যুক্তি, সকল বিরুদ্ধ তর্ক এবং সকল বিরুদ্ধ সাক্ষ্য যে বিশ্বাসকে এক-চুল সরিয়ে দিতে পারে না, তারই নাম আসল বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস অম্‌নি আসে না। তার জন্য, সম্পূর্ণ না হোক্ অন্ততঃ আংশিক হ'লেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই। সাধন-ভজন কর, মনকে শাসনাধীনে আন্‌বার জন্য অবিরল ভাবে চেষ্টার পর চেষ্টা চালাও, কালে বুঝ্‌তে পাবে এবং বিশ্বাস আস্‌বে। কামাচার আর কামুকতা এক কথা নয়। কামা-চার ছাড়াও কামুকতা সম্ভব, আবার কামুকতা ছাড়াও কামাচার

সম্ভব। তবে, কামাচার ছাড়া কামুকতা যত অধিক সম্ভব, কামুকতা ছাড়া কামাচার তত অধিক সম্ভব নয়। যোগাসনে ব'সেও কামুকতা সম্ভব, আবার কামচর্চ্চায় থেকেও যোগাভ্যাস সম্ভব। কিন্তু প্রথমটী যত সহজে সম্ভব, দ্বিতীয়টী তত সহজে সম্ভব নয় এবং প্রথমটী যেমনই নিন্দনীয়, দ্বিতীয়টী গৃহীর পক্ষে তেমনই প্রশংসনীয়। সাধারণতঃ গৃহীর জীবন থেকে কামাচারকে নির্ব্বাসিত করার উপায় নেই। নানা প্রয়োজন থেকেই গৃহীকে কামাচারের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে হ'তে পারে; কিন্তু কামাচার থেকে যাতে কামুকতা নির্ব্বাসিত হ'য়ে যায়, তার জন্য যদি ক্রমাগত চেষ্টা কর্ত্তে থাক, তা হ'লে এমন একটা সময় আস্‌বেই, যখন কামাচার থেকে কামটা পৃথক্ হয়ে যাবে। মন যদি ভগবানে থাকে, তাহ'লে কাম পালাবার পথ পায় না। কিন্তু সর্ব্বসময়েই যার মন ভগবানে থাকে, কামাচার ব্যাপারটা এমনি ভীষণ যে, তার মনও কামাচারের সময়ে ভগবানে থাক্‌তে চায়না, দেহের সুখের প্রার্থনাই কর্ত্তে থাকে। কিন্তু হাজার হোক্ সে মন ত'! মনের স্বভাবই হ'ল এই যে, সে শক্তের ভক্ত নরমের যম। শক্ত হাতে তার টুঁটি চেপে ধর্‌লে তাকে যে দিকে খুসী সেই দিকে নিতে পার্‌বে। মন যদি দেহের সুখে না থাকে, তবে কামাচারের মধ্যে আর কাম থাক্‌বে কি করে?

যে ভাষা প্রয়োগে, যে ব্যবহারে একের বা অন্যের কামোদ্রেক সম্ভব, হস্ত-পদ-মুখাদির যেরূপ সঞ্চালন কর্‌লে একের বা অন্যের কামোদ্রেক সম্ভব, তাকেই বলি কামাচার। মনে যদি কাম নাও থাকে, তবু এই আচারকে বল্‌ব কামাচার। সাধন-ভজনের গুণ হচ্ছে এই যে, তাতে কামাচার থেকে কাম দূর হয়ে যেতে পারে।

সন্তান-জননরত গৃহীরা সকলেই কামুক নন, কিন্তু কামাচারী

প্রত্যেকেই। মনশ্চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্য জননকালে তিনি প্রাণায়াম কত্তে পারেন, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি ও লক্ষ্য রেখে দেহের স্পন্দনে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ কত্তে পারেন এবং এইসব কৌশলের মাহাত্ম্যে দেহসুখের প্রার্থনাকে এবং দেহসুখের অনুভূতিকে দূর করে দিয়ে নিষ্কাম হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর যা ব্যবহার, তাকে কামাচারই বল্‌ব। শত শত জনে যা' করে থাকে কামের দায়ে, যোগাভ্যাসী গৃহী তাই করে যাচ্ছেন কামলিপ্সাহীন হয়ে,—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। উনি কামাচারী,কিন্তু কামুক নন। কামাচারকালে কামের অভাব হেতু তাঁর কোন প্রকার দৈহিক কামানুভূতি থাকে না। গৃহস্থ যোগী বলেন, দেহটাকে দেহের কাজে নিযুক্ত ক'রে দিয়ে তিনি এমন এক অপূর্ব্ব অবস্থায় এসে পড়েন যে, দেহ তাঁর আছে কি নেই, সেই খেয়াল পর্য্যন্ত থাকে না। সে সময় কেউ যদি তাঁর পায়ের একটা আঙ্গুল কেটে নিয়ে যায়, তিনি তাও টের পান না।

যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাই যখন লড়াই করে, তখন মন থাকে তার শত্রুনাশে, তাই বুকের মাঝখানে গোলাগুলি পড়্‌লেও সে টের পায় না। শিক্ষা-নবীশ যোদ্ধার হয়ত প্রাণভয় থাকে, কিন্তু পাকা যোদ্ধার চিত্ত-চঞ্চলতা থাকে না। গৃহী সাধকেরও তেমন। অবশ্য, এরূপ অবস্থা লাভ কত্তে গৃহী সাধকদের বহুবর্ষব্যাপী সাধন প্রয়োজন। দু-এক বৎসরে বড় একটা হয় না। প্রথম প্রথম কামাচার থেকে কামটুকুকে পৃথক্ করে নিতে বড় কেউ পারেন না। সাধন ভজন কত্তে কত্তে এ ক্ষমতা ক্রমশঃ এসে যায়। সাধন ভজনের অসাধ্য কিছুই নেই।

যে সাধনই কর দ্বাদশ বর্ষ একাগ্র মনে করা চাই, তবেই সিদ্ধি। এই জন্যই বারো বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে তারপরে গৃহী হবার ব্যবস্থা, আগে নয়। গোঁড়া ওস্তাদরা বলেন, বারো বৎসর সারেগামা না সাধলে সঙ্গীত শিক্ষা করা যায় না। একজন পালোয়ান

আমাকে বলেছিলেন, একাদিক্রমে বারো বৎসর কুস্তি না করলে শরীরই ঠিক হয় না।

সন্তান-প্রসবের পর যতদিন পর্য্যন্ত না প্রসূতির দেহ পূর্ণ সুস্থ হচ্ছে, যতদিন না সন্তান মাতৃস্তন্য ছেড়ে দিচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত পুনরায় সন্তান-জনন অসঙ্গত। মোট কথা একটী সন্তান তিন বৎসর বয়ঃক্রম না পাওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় সন্তান-জনন-চেষ্টা কর্ত্তব্য নয়।

কিন্তু গৃহীরা যদি এরূপ সংযম রক্ষা ক'রে চল্‌তে না পারে, তার জন্যই সাধন-ভজন দরকার। সাধন-ভজনের বলে কামার্ত্ত মন প্রেমার্ত্ত হয়, দেহলোভী মন পরমাত্মলোভী হয়।

গৃহীদের ও সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনে কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা মূলগত নয়, শাখাগত, উৎসগত নয়, প্রবাহগত। কি গৃহী, কি প্রব্রজিত, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি কিশোর, কি বৃদ্ধ, মূল সাধন সকলেরই এক। তবে, গৃহীদের সুযোগ-অসুযোগে, আর সন্ন্যাসীর সুযোগ-অসুযোগে পার্থক্য আছে। স্ত্রীজাতির সুযোগ-অসুযোগে আর পুরুষদের সুযোগ-অসুযোগে পার্থক্য আছে। কিশোর ও যুবকের শক্তি-সামর্থ্যে তফাৎ আছে। তাই প্রণালীর তফাৎ। কিন্তু সকল প্রণালীর মূল লক্ষ্য যোগে বা চিত্তস্থৈর্য্যে। ধর্ম্মসাধনায় সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর অবসর কম, আবার ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে গৃহীর লিপ্ততা অবশ্যম্ভাবী। এই দুই কারণেরই জন্য প্রণালীর পার্থক্য হচ্ছে।

জীবের যত কিছু সাধন-ভজন, সবই দুটীমাত্র শব্দ নিয়ে। একটী হচ্ছে "আমি", অপরটী হচ্ছে "তুমি"। অদ্বৈতবাদী হও, দ্বৈতবাদী হও, আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, এই দুইটী শব্দের মূলধন নিয়েই তোমার সাধন-ভজনের সমুদয় কারবার। হয় তুমি আর আমি অভেদ; নয় তুমি আমার, আমি তোমার; নয় তোমাতে আমি, আমাতে তুমি;

নয় তোমা হ'তে আমি, আমা হ'তে তুমি;—এই রকমে "তুমি" আর "আমি" দিয়ে আমরা যার যার রুচিমত প্রকৃতিমত সামর্থ্যমত নানাবিধ সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে পাতিয়ে নিচ্ছি। রুচি-প্রকৃতি বুঝে কারো অভেদ-সম্বন্ধ, কারো ভেদ-সম্বন্ধ, কারো বা ভেদা-ভেদ-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই ডাকাডাকির কৌশলে কোথাও "সোহং", কোথাও "হংস,"—"অহং-সঃ", কোথাও "ওঁ"—কারে পরিণত করা হচ্ছে। এই ব্যাপার নিয়ে যিনি যত অধিক ডুবে যেতে পাচ্ছেন, তাঁর সাধন-প্রণালী তত সূক্ষ্মস্রোতা হয়ে আস্ছে। গৃহীর বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ততা বেশী, বহির্ম্মুখী বিক্ষিপ্ততা অধিক, তাই ডোব্‌বার সুযোগ তার কম। এই জন্যেই সন্ন্যাসীদের তুলনায় গৃহীর প্রণালীর স্রোত অনেক সময় একটু স্থূল। অগ্রসর হ'তে হ তে গৃহী এই স্থূল স্রোত অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম স্রোতে যেতে পারেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে কাজটা আংশিকভাবে সোজা। এই জন্যই প্রায়শ দেখা যায়, সন্ন্যাসীদের মধ্যে নির্গুণ উপাসক, নিরাকার উপাসক বা অদ্বৈতভাবের সাধকের সংখ্যা বেশী। জোর-জবরদস্তি করে ত' সাধন হয় না, যার যার অবস্থার অনুকূলভাবেই ধর্ম্মমত ও সাধনপথ গড়ে নিতে হয়। ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্ভবস্থান ত' বেদ, কোরাণ বা বাইবেল নয়, যার যার নিজ প্রকৃতিই যার যার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের জন্মভূমি। একজন যে গৃহী হচ্ছে, আর একজন যে সন্ন্যাসী হচ্ছে, প্রকৃতি-পার্থক্যই তার আদি কারণ। দৃষ্টান্ত যেমন, গৃহীর ইন্দ্রিয়-জয় আর সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়জয়ের ধারণায় পার্থক্য আছে। এই জন্যই গৃহী ও সন্ন্যাসীর সাধন-প্রণালীর পার্থক্য। ভোগ্য-পরতন্ত্র হবেন না, অথচ ভোগ কর্‌বেন, এ হ'ল গৃহীর ইন্দ্রিয়-জয়। আর, গৃহত্যাগীর ইন্দ্রিয়জয় হচ্ছে, ভোগ্য বিষয়ে অপ্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত ভোগরাহিত্য। ইন্দ্রিয়জয়ী গৃহী সন্তান-জনন কর্ব্বেন। কেন

কর্ব্বেন ? না, কল্যাণ-সাধনাকে পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রবাহিত রাখ্‌বার জন্যে। কিন্তু সন্তানজনন ইন্দ্রিয়ভোগ সাপেক্ষ। সুসন্তান-জননের জন্য জনক ও জননীর সুপুষ্ট দেহ রসনার ভোগ-সাপেক্ষ। পুরুষানুক্রমিক সৌন্দর্য্য-বোধ ও সুষ্ঠুতাবোধ রক্ষাকল্পে জনক-জননীর চক্ষুর ভোগও চাই। তাই গৃহীর ইন্দ্রিয়জয় সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়জয় হ'তে পৃথক্। ভোগ্য-পরতন্ত্র না হ'য়ে যদি ভোগ হয়, এই ভোগ যদি পুণ্যসঙ্কল্প-মূলক হয়, এবং সঙ্কল্পপূরণার্থ যতটুকু প্রয়োজন, এই অনাসক্ত ভোগ যদি তার অতিরিক্ত না হয়,—তবেই গৃহীর সেরা ইন্দ্রিয়জয় হ'ল। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে ইন্দ্রিয়জয়ের মাপকাটি আলাদা। সর্ত্তও আলাদা। গৃহী ইন্দ্রিয় জয় করে চলতে অক্ষম হ'লে তার জন্য কঠিন শাসন নাই, সন্ন্যাসী অক্ষম হ'লে তার প্রায়শ্চিত্ত কঠোর। ইন্দ্রিয়ব্যাপারে রুচিমাত্রেই সন্ন্যাসী ব্রতচ্যুত, ক্রিয়ানিষ্পত্তি দূরের কথা, রমণেচ্ছা মাত্রেই সে পতিত, সামান্য চিত্তবিভ্রংশেই সে অধম পাপী। কিন্তু গৃহীর ? রমণেচ্ছা ছোট কথা, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে রত হলেও সব সময়ে তা' ত্রুটী বলে বিবেচিত হয় না এবং যখন তা' ত্রুটী ব'লে বিবেচিত হয়, তখনও তার জন্য ক্ষমা আছে। এই সব পার্থক্যের দরুণেই গৃহী আর সন্ন্যাসীর সাধন-প্রণালীতে তফাৎ হয়। আরও একটা কথা আছে, যাতে গৃহীর সাধন আর সন্ন্যাসীর সাধন নিজে থেকেই দুই দিকে চলেছে। গৃহীর জীবন দ্বৈতের ; স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে, স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে জীবন যাপন কচ্ছেন, একজনের অভাবে অপরের চলে না, একজনের প্রতি অপরের ভালবাসা না থাক্‌লে অধর্ম্ম ও অশান্তি হয়, একজনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা ক'রে অপরের চল্‌বে না, এক জনের জন্য আর একজনের দরদ, আকুলতা ও আকর্ষণ স্বাভাবিক। সুতরাং গৃহীর গৃহে ভগবৎ-সাধনার ভঙ্গীটী দ্বৈতবাদেই প্রভাবিত হবে। নিরাকারের উপাসক

হ'য়েও ব্রাহ্ম-সমাজের অধিকাংশ জ্ঞানী এই জন্যই অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হন নি। তাঁরা যদি সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ-ধারণা-গ্রস্ত না হ'তেন, তাহ'লে ঐ সমাজেও অদ্বৈতবাদ স্থান পেত,—প্রধানভাবে না হোক্, অন্ততঃ অপ্রধান ভাবে। আবার দেখ, অবিবাহিত সন্ন্যাসীর দলে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বেশী। কারণ, নিঃসঙ্গ-জীবন যাপনকারীর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদ কতকটা নিঃসঙ্গ্ গোছেরই হবে। প্রতিদিনকার জীবনে যিনি নিজেকে ব্যতীত আকর্ষণের অন্য কোনও বস্তুর সংস্পর্শে আসেন না, তারপক্ষে অদ্বৈতবাদী না হওয়াই আশ্চর্য্য। স্ত্রী বা স্বামী, যার মত আকর্ষণের বস্তু পুরুষ বা নারীর কাছে জগতে আর নেই, তা যিনি স্বীকার করেন নি, তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে একমাত্র নিজেকেই ত' পাচ্ছেন, নিজেকে নিয়েই তাঁর ঘরকন্না, নিজের প্রতিই তাঁর প্রেম, নিজেকে নিয়েই তাঁর বোঝা-পড়া। তাই তিনি বলে থাকেন,—"কোহহম্?—সোহহম্! আমি কে? না আমিই ব্রহ্ম।"

আমি গৃহীদের পক্ষে অদ্বৈতবাদের বিরোধী মোটেই নই। তবে পাত্র বুঝে ব্যবস্থা। খাঁটি দ্বৈতবাদ বা খাঁটী অদ্বৈতবাদ বলে কোন জিনিষ বোধ হয় নেই। দ্বৈতবাদে অদ্বৈতভাব আছে, অদ্বৈতবাদে দ্বৈতভাব আছে। কারো পক্ষে অদ্বৈত ভাবের আধিক্য, আর, কারো পক্ষে দ্বৈতভাবের আধিক্য স্বাভাবিক। জীবনের কর্ম্মের সাথে সাধন-পন্থাকে মিলিয়ে না নিতে পার্‌লে ত' আর ধর্ম্ম হয় না! তাই, চির-কালই জগতে বিভিন্ন আধারের যোগ্যতা বুঝে দ্বৈত ও অদ্বৈতের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ হতে থাক্‌বে। শুধু অদ্বৈতবাদের উপর ঝোঁক দেওয়া একটা গোঁড়ামি বিশেষ। কারণ, পাত্রবিশেষে'আমিই ব্রহ্ম'—এই কথাটা যত elevating, যত ennobling, 'আমি তাঁর দাস'—কথাটাও পাত্র-বিশেষে তার চেয়ে কম elevating বা ennobling নয়। যার

যার মনের ও মস্তিষ্কের গঠন বুঝে দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদের প্রাবল্য-অপ্রাবল্য ঘটে থাকে। জোর ক'রে কখনও কারো মাথায় foreign elements (বিরুদ্ধ ভাব) ঢুকিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। যারা দ্বৈতমতে ছাড়া সাধন-ভজন-তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তাদের কাছে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা কত্তে গিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে দ্বৈতের অনুকূল ভাবে। দ্বৈত-বাদীদের পক্ষেও অদ্বৈতবাদীদের ঘাড়ে চাপ্‌বার চেষ্টা সঙ্গত নয়। কেউ কারো ঘাড়ে চেপে কখনও সত্যিকার জয় লাভ কত্তে পারে না। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ না হ'য়ে ব্যাপারটা যখন দাঁড়াবে গিয়ে সাধ্যমত সাধন-ভজনে, তখন আর বিরোধের হট্টগোল থাকবে না। ভাগবত পাঠের নাম সাধন ভজন নয়, ভাগবত প্রভৃতি সাধনের নিষ্ঠা-প্রবর্ত্তক মাত্র। বৈদান্তিক তর্কবিচারও সাধন নয়, এই সব তর্কবিচারে সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই জন্যই ভাগবত পাঠ, এই জন্যই ব্রহ্মবিচার। যখন সাধনের পরিপোষক না হবে, তখন ভাগবত পাঠে ধর্ম্ম হয় না, অধর্ম্ম হয়, তখন বেদান্তের বিচারে বন্ধন-মুক্তি ঘটে না, বন্ধন বাড়ে।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের

নিঃস্বার্থ পরোপকার

বিগত বহুবর্ষ ব্যাপিয়া শ্রীমৎস্বামিজী **হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও উন্মাদ** রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের দ্বারা নিরাময় করিয়াছেন। কিন্তু আশ্রম অযাচক বলিয়া রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হেতু বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান আর সম্ভব নহে, খরচ মূল্যটা লইতেই হয়। তিনমাস ব্যবহারের উপযোগী দুই শত সত্তর (২৭০) মাত্রা হইতে চারি শত পঞ্চাশ (৪৫০) মাত্রা ঔষধ সাধারণতঃ ৫৲ হইতে ৯৲ টাকা এবং ঔষধ প্রেরণের মাশুল ॥৵০ আনা লওয়া হয়। কোনও প্রকার লভ্য বা পারিশ্রমিক রাখা হয় না। বিপন্ন ব্যক্তিরা পরপৃষ্ঠায় লিখিত প্রশ্নাবলির বিস্তারিত উত্তর প্রেরণ করিলে রোগনির্ণয় সম্ভব হয়। অতি তুচ্ছ একটী ঘটনা বা লক্ষণও অনেক সময়ে অতি কঠিন ব্যাধির ঔষধ নির্ব্বাচনে সহায়তা করে। উত্তরের জন্য সর্ব্বদা নিজ নিজ নাম ঠিকানা লেখা খামে /৫ মূল্যের টিকিট আঁটিয়া দিতে হয়, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার, কারণ আশ্রম ডাকঘর ও বাজার হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। কদর্য্য হস্তাক্ষরে পত্র লিখিলে সেই পত্র পাঠ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্টাক্ষরে লেখা আবশ্যক। কৃপাপূর্ব্বক প্রত্যেকেই এই কথা মনে রাখিলে ভাল হয় যে, ঔষধবিভাগ আশ্রমের ব্যবসায় নহে, অর্থার্জ্জনের পন্থা নহে, জীবিকা নহে। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণাই এই বিভাগের জন্ম দিয়াছে।

হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও উন্মাদ রোগীর প্রশ্নাবলি

রোগীর নাম, বয়স, রোগ কতদিনের, কি কি চিকিৎসা হইয়াছে, চিকিৎসকেরা কি রোগ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, পূর্ব্ব-চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ ও ফলাফল। পূর্ব্বাপর একই অবস্থায় আছে কিনা, না, তিথি বিশেষে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে? নিদ্রাবস্থায় কখনো হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠে কিনা? ফিট্ হয় কিনা? ফিট হইলে দিবসে কতবার এবং কতদিন অন্তর? ফিটের পূর্ব্বে টের পাওয়া যায় কিনা? ফিট নিদ্রাবস্থায় না জাগ্রদবস্থায় হয়? ফিটের সময় মল, মূত্র, বীর্য্য বা রজঃস্রাব হয় কিনা। ফিটের পূর্ব্বে বা পরে বা সঙ্গে সঙ্গে বমন কফস্রাব বা লালাস্রাব হয় কিনা। ফিট আরম্ভ হইবার সময়ে বা পরে প্রলাপ বকে কিনা, ফিট ভাঙ্গিয়া গেলেও নেশার ভাব থাকে কিনা। মাতামহ বা পিতামহ বংশে কাহারও উন্মাদ মৃগী, হিষ্টিরিয়া, যক্ষ্মা, উপদংশ, মদ্যপানের অভ্যাস বা গঞ্জিকা সেবন ছিল কিনা। বর্ত্তমানে উন্মাদভাব প্রকাশ পাইয়া থাকিলে পূর্ব্বে কখনও মৃগী বা হিষ্টিরিয়া ছিল কিনা। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের পরে রোগ কমে বা বাড়ে কিনা। অত্যধিক বাক্যালাপ, হাস্য, ক্রন্দন, অশ্লীল কথা, উলঙ্গ হইবার ইচ্ছা আছে কিনা। কাম-প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য কিরূপ? মস্তক নত করিয়া বসা, বাক্যালাপে বিরক্তি, মুখ নাসিকা বা চক্ষু হইতে স্রাব, শরীরে কম্প, আহারে অরুচি। নিদ্রাধিক্য বা নিদ্রার অল্পতা, বাতের আক্রমণ, মাঝে মাঝে শরীরের কম্পন আছে কিনা? বুকে বেদনা, হৃৎকম্প বা হৃদরোগ আছে কিনা। চক্ষুর বর্ণ, নিদ্রা, আহার, ও সন্দেহবায়ু কিরূপ? শৃঙ্খলাবদ্ধ কিনা, ঔষধ সেবন সম্ভব কিনা, কোষ্ঠ কিরূপ, ক্ষুধা কিরূপ, অম্লরোগ বা অজীর্ণ রোগ বা অর্শরোগ বা বাতের আক্রমণ আছে কিনা। নাভিতে, তলপেটে বা জননেন্দ্রিয়ে বেদনা বা ক্ষত আছে কিনা? ফিটের সময় অথবা সুস্থাবস্থায় হাত পা ঘাড় মুখ বাঁকায় কিনা। স্ত্রীলোক হইলে মাসিক রজঃস্রাব নিয়মিত কিনা, মাসিকের সময়ে ব্যথা বা দুর্গন্ধ হয় কিনা, গর্ভাবস্থা হইয়া থাকিলে কয় মাস গর্ভ? সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ, শান্ত না অসহিষ্ণু? রোগসৃষ্টির পর স্থূল বা কৃশ হইতেছে? সাধারণতঃ শরীর স্থূল বা কৃশ? রক্তচিতার কাঁচা মোটা মূল একসের পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন কিনা। আশ্রমে আনিয়া রোগী দেখান সম্ভব কিনা? আমরা নিজ ব্যয়ে যাইয়া রোগী দেখিয়া আসিতে চাহিলে, ব্যয়ের কত অংশ বহনে আপনার ক্লেশ হইবেনা? সর্ব্বদা উত্তরের জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট সহ পত্র দিবেন। স্পষ্ট অক্ষরে পত্র লিখিবেন।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

পুপুন্‌কী-অযাচক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম

পোঃ চাশ, মানভূম, ছোটনাগপুর।

বিনামূল্যে

সদ্‌গ্রন্থ-প্রচার



যাহারা মূল্য দিয়া মৎপ্রণীত গ্রন্থ ক্রয়ে সমর্থ নহেন, এমন সহস্র ব্যক্তিকে আমার রচিত একখানা করিয়া আট আনা মূল্যের পুস্তক বিনামূল্যে ও অর্দ্ধেক ডাকমাশুল বহন করিয়া প্রেরণ করিব। পুস্তক প্রার্থীকে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া **"লেখাপড়া জানা পঁচিশ জন বিবাহিত ধার্ম্মিক ভদ্রলোকের নাম ও ঠিকানা"** প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক নামের সহিত কি কি বিবরণ দিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। নাম

২। গ্রাম

৩। ডাকঘর

৪। জেলা

৫। বয়স

৬। কি কার্য্য করেন।

বেয়ারিং পত্র রাখা হইবে না। অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিলে উপহার প্রেরিত হইবে না। একই পল্লী হইতে চারিটার অধিক নাম ঠিকানা প্রেরণ বাঞ্ছনীয় নহে।

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম

পোঃ চাস, মানভূম, (বি, এন্, আর)